হকিকতে মুসলমান-ই বাঙ্গালা
খন্দকার ফজলে রাব্বি

প্রসংগ-কথা

বাংগালী মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করেন। এদেশের মুসলমান সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে বহু ভুল-ভ্রান্তি বিদ্যমান।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজের প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া এদেশের মুসলমানের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার সংগে সংগে উপরোক্ত কাজেও আত্মনিয়োগ করেছে। এদেশের মুসলমান তার উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হোক, এ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা একাডেমী জনাব খন্দকার ফজলে রাব্বির 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস্ অব বেংগল' নামক গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশের উদ্যম গ্রহণ করেছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে খন্দকার ফজলে রাব্বি মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর এ পুস্তকখানি এক সময়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

গ্রন্থখানিতে পরিবেশিত কোন কোন ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবুও সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক : বাংলা একাডেমী।

স্নেহের বোন

আ য়ে শা খা তু ন কে—

অনুবাদকের অন্যান্য প্রকাশিতব্য গ্রন্থ :

প্রবন্ধ পঞ্জী

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী (অনুবাদ)

আরব্যোপন্যাস (অনুবাদ)

বাংলা অনুবাদকের কথা

বাংগালী মুসলমানদের পরিচয় কি, তারা কি বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর, না এদেশেরই ধর্মান্তরিত হিন্দু পূর্বপুরুষদের বংশধর, এ নিয়ে বিতর্কের অবসান আজো হয়নি। মুর্শিদাবাদের নওয়াব বাহাদুরের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি সাহেবই সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে পূর্ণাংগ আলোচনা করেন তাঁর 'হকিকতে মুসলমান-ই বাংগালা' নামক ফার্সি গ্রন্থে। বেভার্লি, রিজলি, হান্টার প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিত তাঁদের গ্রন্থাবলীতে বাংলার মুসলমানকে নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু থেকে উদ্ভূত বলে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন, ফজলে রাব্বি সাহেব বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ও সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে নানা তথ্য উপস্থিত করে সেগুলি খণ্ডন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে অধিকাংশ বাংগালী মুসলমানদের পূর্বপুরুষ ছিলেন আরব, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে আগত মুসলমান। তাঁর এ মতের সমর্থনে তিনি বহু জোরালো যুক্তিও দেখিয়েছেন। তাছাড়া বহু মূল্যবান তথ্যের সাহায্যে তিনি বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

দেওয়ান ফজলে রাব্বি সাহেব তাঁর গ্রন্থখানির বহুল প্রচারের এবং বাংগালী মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে ইংরেজ

সরকার ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে নিজেই এর ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং এর নাম দেন The Origin of the Musalmans of Bengal; বাংলা একাডেমী এ ধরনের গ্রন্থ অনুবাদের পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এদেশে গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য বিধায় আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন বৃটিশ মিউজিয়াম কিংবা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে উক্ত গ্রন্থখানি নকল করে আনার জন্যে আমাকে পত্র লেখেন। আমি বৃটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগ ঘেঁটে গ্রন্থটির সন্ধান পাই এবং নকল করে এনে নিজেই এর অনুবাদ করি।

একথা সত্যি যে ইতিহাসে বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসে অভিজ্ঞ কোনো অধ্যাপক কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তি এ গ্রন্থখানা অনুবাদ করলে কম ত্রুটিপূর্ণ হতো। আমার এ অনুবাদ যে ত্রুটিমুক্ত হয়নি তা অকপটে স্বীকার করছি। বিশেষ বিশেষ ফার্সি বা বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি নবাগত বলে পাঠকগণ সহানুভূতির সহিত আমার ত্রুটিগুলি ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আশা করি।

পরিশেষে আমার অগ্রজ তুল্য জনাব সরদার ফজলুল করিম ও বন্ধুবর গোলাম সামদানী কোরায়শীর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—যাঁদেরকে অনুবাদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিরক্ত করেছি।

মুঃ আবদুর রাজ্জাক

সূচীপত্র

পূর্বকথা

ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রদেশ বা অঞ্চল থেকে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা অধিক বলে বাংগালী মুসলমানদের এই সংখ্যাধিক্যের কারণ এবং তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানের কিছু প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার মতো কোনো পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশিত না হওয়ায় সঠিক তথ্যের অভাবে অনুসন্ধানী লোকেরা সাধারণতঃ উল্লিখিত বিষয়ে ভ্রান্তিপূর্ণ মত গঠনে তৎপর হন এবং নিজেদের কল্পনা শক্তির ভিত্তিতে অনুমিত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন।

কাজেই আমি বাংলার ইতিহাস ও ঘটনাপঞ্জীর পাতায় পাতায় সযত্ন অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করেছি এবং এভাবে আমি এ গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছি। উপরোক্ত উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে আমার সাধ্যমতো আরো অনেক তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলির সবই আমি এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবিষ্ট করেছি এবং এর নাম দিয়েছি ('হকিকতে মুসলমান-ই-বাংগালা) কিংবা 'দি অরিজিন অব দি মুসলমান্স্ অব বেংগল' এ গ্রন্থের মধ্যে যদি পাঠকদের কেউ কোনো ভুলের সন্ধান পান তাহলে তাঁরা উদারতার সংগে সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার অনুরোধ ভবিষ্যতে এর সংশোধনের জন্যে পাঠকগণ এ ভুলগুলিকে লেখকের গোচরে আনবেন।

এ গ্রন্থ রচনার অগ্রগতিতে আমার কনিষ্ঠ ভাই খন্দকার আলী হায়দার এবং আমার বন্ধু ও দিল্লীর অধিবাসী মির্যা ফররুখ সাহেবের মূল্যবান সাহায্য দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাছাড়া 'Priceless Pearls' ও 'Lament of Islam' গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা মৌলবি অলকদরি সৈয়দ হাসিবুল হুসেন বি. এ সাহেবের নিকটও জানাচ্ছি আমার কৃতজ্ঞতা, যিনি এ গ্রন্থের অনুবাদে আমাকে মূল্যবান সাহায্য দান করেছেন।

খন্দকার ফজলে রাব্বি
মুর্শিদাবাদ।

সূচনা

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাংলা প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ১৩৬৫৮৩৪৭ জন। এই মোট সংখ্যার মধ্যে মূল বাংলায় ১৯৫৭৭৪৩১, বিহারে ৩৫০৪৪৮০, উড়িষ্যায় ৯২৪৬৮, ছোট নাগপুরে ২৫৭৮০৯ এবং বাংলা সরকারের অধীনস্থ করদ রাজ্যগুলিতে (যথা— কোচবিহার, উড়িষ্যার কতিপয় পার্বত্য অঞ্চল ও দেশীয় রাজ্য এবং ছোট নাগপুর) ১৮৩৬৭০ জন মুসলমান ছিলো।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সরকারী হিসাব মতে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা ছিলো পাঁচ কোটি। এই মোট সংখ্যার মধ্যে অর্ধেকের কিছু কম অর্থাৎ ১৩৬৫৮৩৪৭ জন মুসলমান ছিলো বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এবং ১৯৫৭৭৪৮১ জন ছিলো মূল বাংলায়। এরূপে মূল বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানের এক তৃতীয়াংশ ছিলো।

বাংলার কয়েকটি বিভাগ ও জেলায় বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারের রিপোর্ট মোতাবেক বাংগালী মুসলমানদের বিস্তারিত বিবরণ

বিভাগ	জেলা	প্রতিটি জেলার মুসলমানদের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
বর্ধমান	বর্ধমান	২৬৭২২৪	৯৯৯ ৯১
	বাঁকুড়া	৪৫৩১২	
	বীরভূম	১৬৯৭৫২	
	মেদিনীপুর	১৭১৪১২	
	হুগলী	১৯২৬৮৫	
	হাওড়া	১৫২৮০৬	
প্রেসিডেন্সী	২৪ পরগণা	৬৯০৮১৫	৪২১৪১৬১
	কলিকাতা	২০৩১৭৬	
	নদিয়া	৯৪৭৩৯০	
	যশোহর	১১৫০১৩৫	
	মুর্শিদাবাদ	৬১৮৬৫৩	
	খুলনা	৬০৩৯৯৫	
রাজশাহী	দিনাজপুর	৮০২৫৯৭	৫০২৫৩৩০
	রাজশাহী	১০৩৩৯২৭	
	রংপুর	১২৯৫৪১১	
	বগুড়া	৬৬১১০০	
	পাবনা	৯৯৯৮০৯	
	দার্জিলিং	১০০১১	
	জলপাইগুড়ি	২২২৪৭২	

বিভাগ	জেলা	প্রতিটি জেলার মুসলমানদের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
ঢাকা	ঢাকা	... ১৪৭৩৭৯৯	৬৪২৯০১৭
	ফরিদপুর	... ১০৯৬০৩০	
	বাখরগঞ্জ	... ১৪৬২৭১২	
	ময়মনসিংহ	... ২৩৯৬৪৭৬	
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	... ৯২৪৮৪৯	২৯০৯৭৮২
	নোয়াখালী	... ৭৬০৫৯৭	
	ত্রিপুরা	... ১২২৪৩৩৬	
পাটনা	পাটনা	... ২০১০৮৬	১৮০৬১২২
	গয়া	... ২২৬৭০৫	
	শাহাবাদ	... ১৪৮৪৫৯	
	দ্বারভাংগা	... ৩৩৮৬৬৭	
	মোজফ্‌ফরপুর	৩৩২৮৭৩	
	সরণ	... ২৯১০১৩	
	চম্পরণ	... ২৬৭৩১৯	
	ভাগলপুর	... ১৯৫৫৯১	১৬৯৮৩৬৫
	মুংগের	... ১৯১৭৭০	
	পুর্ণিয়া	... ৮০৫২৬৭	
	মালদহ	... ৩৮৪৬৫১	
	সাঁওতাল পরগণা	১২১০৮৬	

মূল বাংলা ... ১২৫৭৭৪৮১ [১]
বিহার ... ৩৫০৪৪৮৭
উড়িষ্যা ... ৯২৯৪৬
ছোট নাগপুর ২৫৭৮০৯ — সর্বমোট
কোচবিহার ১৭০৭৪৬ — ১৩৬৫৮৩৪৭
উড়িষ্যা করদরাজ্য সমূহ } ৬১৯১
ছোট নাগপুর করদরাজ্য সমূহ } ৬৭৩৩

উপরোল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, মূল বাংলায় মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা রয়েছে। বাংলা সরকারের সদ্য প্রকাশিত শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি দেখেছি যে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা যেখানে ১৯৫৮২৩৪৯ জন, হিন্দুদের সংখ্যা সেখানে ১৮০৬৮৬৫৫ জন অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষে রয়েছে পনেরো লক্ষেরও বেশী লোকের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা। বিহারে রয়েছে হিন্দুদের বিরাট সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, মুসলমানদের চাইতে ছয় গুণেরও বেশী; আবার উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরে মুসলমানদের সংখ্যা সেখানকার জনসমষ্টির একটা ভগ্নাংশ মাত্র। যে সমস্ত কারণে উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে পারেনি, পশ্চিম বংগে মুসলমানদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার পেছনেও সেই

১ বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী—এই বিভাগগুলিসহ।

কারণগুলিই কার্যকরী হয়েছে। পশ্চিম বংগে এ দুটি বৃহৎ জাতির লোক সংখ্যা আমরা নিম্নরূপ দেখতে পাই—

হিন্দু ... ৬৩৯৯৯২৯
মুসলমান ... ৯৯৯১৯১

তিনটি প্রদেশকে একত্রে ধরলে আমরা দেখতে পাই যে বিহার ও উড়িষ্যায় এবং ছোট নাগপুর ও পশ্চিম বংগের জেলাগুলিতে মাত্র পাঁচ মিলিয়নের মতো মুসলমান রয়েছে, যেখানে হিন্দুর সংখ্যা বত্রিশ মিলিয়ন। কিন্তু মধ্য ও পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অনেক বেশী। মহামান্য ছোট লাট বাহাদুর কর্ত ক শাসিত সমগ্র অঞ্চলের লোক সংখ্যা এভাবে বিভক্ত হয়েছে—

হিন্দু ... ৪৫২১৭৬১৮
মুসলমান ... ২৩৬৫৮৩৪৭

মধ্য ও পূর্ব বাংলা প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই চারটি বিভাগ নিয়ে গঠিত কিংবা চারটি কমিশনারের শাসনাধীন এবং এখানকার লোক সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত—

মুসলমান ... ১৮৫৮৩১৫৮
হিন্দু ... ১১৬৬৮৬৮৬

বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশী কেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে এবং তাদের উৎপত্তি, যেমন—তাদের পূর্ব পুরুষগণ এ দেশীয় হিন্দু কিনা, যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে কিংবা তারা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের বংশধর কিনা, যারা এদেশে আগমন করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে ইত্যাদি নিরূপণ করতে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন; যথা - (১) ইতিহাস কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণ, (২) মুসলমানদের বিভিন্ন লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য; (৩) এই মুসলমানদের নৃকুলতত্ত্ব বিষয়ক মুখাবয়ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং (৪) তাদের পরিবারগুলির বিস্তারিত বিবরণ।

প্র থ ম অ ধ্যা য়

ঐতিহাসিক প্রমাণ

'তারিখ-ই-ফিরিশতা'র সপ্তম অধ্যায়ে এ কথার উল্লেখ আছে যে হিজরি ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তখনকার ভারত সম্রাট কুতুব উদ্দীন আইবেকের নির্দেশে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলমান বিজয় সংঘটিত হয়।

বখতিয়ার খিলজি ছিলেন ঘোর রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত আমির। সুলতান গিয়াস উদ্দীন মোহাম্মদ সাম-এর রাজত্বকালে তিনি গজনি আগমন করেন; সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন এবং সুলতান শাহাবুদ্দীনের অন্যতম উচ্চপদস্থ আমির মালিক মোয়াযযম হিশাম উদ্দীনের সংস্পর্শে আসেন। এই সম্ভ্রান্ত আমিরের প্রভাবের জন্যে তিনি দোয়াবায় কিছু পরগণা জায়গির স্বরূপ লাভ করেন। তাছাড়া তাঁর শৌর্য ও শক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে কম্বিলা ও বেতালির জায়গির দান করা হয়। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, উদার ও পরিণামদর্শী। তিনি বিহারের দাংগাবাজ ও উদ্ধত সর্দারদের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযান চালনায় রত ছিলেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ধনসম্পদ হস্তগত করেন। এভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আড়ম্বরপূর্ণ ও উচ্চস্তরের জীবনযাপনের উপযোগী ধন-সম্পদের অধিকারী হন।

নিজেদের দেশের বিপ্লবের জন্যে প্রাচীন ঘোর, গজনি ও খোরাসানের অনেক অধিবাসীই স্বদেশ পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করতো এবং পর্যটকের জীবন গ্রহণ করতো; মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির সাহসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা অবগত হয়ে তারা তাঁর নিকট সমবেত হতো। এই ভাগ্যান্বেষীরা বখতিয়ার খিলজির শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছিলো। তখনকার দিল্লীর সম্রাট কুতুব উদ্দীন আইবেক এ সমস্ত ঘটনার সংবাদ পেয়ে বখতিয়ার খিলজির আচরণ অনুমোদনের প্রতীক স্বরূপ তাঁর নিকট খেলাত (সম্মান-সূচক পোশাক ও অন্যান্য উপহার) পাঠান। এই রাজকীয় অনুগ্রহ তাঁর হস্তকে আরো শক্তিশালী করলো। তিনি তখন সমগ্র বিহারের ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করলেন, সেই রাজ্যের হিন্দু শক্তির সমস্ত নিদর্শন মুছে ফেললেন এবং সেখানে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১১০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বংগদেশ আক্রমণ করেন এবং রাঢ় ও বরেন্দ্র নামে পরিচিত ভূভাগ দখল করেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা তিন ভাগে বিভক্ত ছিলো; যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র ও বংগদেশ। মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি যখন বাংলা জয় করেন তখন এর শাসক ছিলেন লক্ষ্মণ রায়, নদিয়া শহর ছিলো তাঁর রাজধানী। লক্ষণাবতীসহ এই শহর ছিলো রাঢ়ে অবস্থিত। এ সম্পর্কে 'তবাকা'ত-ই-নাসিরি' গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে:

> গংগা নদীর দুই পার্শ্বে লক্ষণাবতী রাজ্যের দুটি শাখা ছিলো। পশ্চিম দিকের শাখাকে বলা হতো রাঢ় এবং লক্ষণাবতী সহর এই শাখায় অবস্থিত; পূর্ব দিকের শাখাকে বলা হতো বরেন্দ্র বা বরেন্দাহ্ এবং দেওকোট শহর ছিলো এর অন্তর্ভুক্ত।

'ফিরিশতা'-তে বর্ণিত আছে যে রাজা লক্ষ্মণের সরকারী কর্মস্থল ছিলো নদিয়ায়, যা লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। 'তবাকাত-ই নাসিরি' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে কিছু সংখ্যক জ্যোতিষী ও ব্রাহ্মণ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন যে, তাঁদের প্রাচীন ঋষিদের পুস্তকে একথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে এ দেশ তুর্কীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) হস্তগত হবে এবং সে সময় যখন আসবে তখন ক্ষমতাসীন রাজা তাদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করবেন, যাতে রাজ্যের অধিবাসিগণ মুসলমানদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে পারে।

রাজা জ্যোতিষীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁদের প্রাচীন ঋষিদের গ্রন্থে মুসলমান সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পরিচয়মূলক কোনো লক্ষণের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে কিনা, যার সাহায্যে সে সম্পর্কে একটা নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। জবাবে তাঁরা বললেন যে, উক্ত সেনানায়কের নিদর্শন হবে এই যে যখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবেন এবং হাত দুটি তাঁর উভয় পার্শ্বে নামিয়ে রাখবেন তখন তাঁর আংগুলগুলি তাঁর হাঁটুর সন্ধিস্থলকে ছাড়িয়ে যাবে। এ ধরনের জবাব পেয়ে রাজা লক্ষ্মণ এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখার জন্যে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে নানাদিকে পাঠালেন; অনুসন্ধানের পর তারা দেখতে পেলো যে, জ্যোতিষিগণ রাজার নিকট যে বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছিলেন সেগুলি মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তারা রাজাকে এ সংবাদ দিলো। সংবাদটি দেশের ব্রাহ্মণ ও বুদ্ধি-জীবী, সর্দার ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করলো; তাঁদের সকলেই কালবিলম্ব না করে জগন্নাথ, কামরূপ এবং অন্যান্য দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন, যা তাঁদের

নিকট নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলো। পরিশেষে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব হলো তাদের সকলেই নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করে অন্যান্য প্রদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। ব্রাহ্মণদের মতো নিজের পৈত্রিক রাজ্য এবং গৃহ পরিত্যাগ করার ধারণা রাজার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বিহার থেকে অভিযান করে তাঁর রাজধানী নদিয়ায় আগমন এবং প্রাসাদের ফটকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি গড়িমসি করে তাঁর রাজধানীতেই অবস্থান করতে লাগলেন। মুসলমানেরা যখন তাঁর প্রাসাদের ফটকে পৌঁছলো, তখন তিনি তাঁর রাজ্য ছেড়ে বংগ দেশের বিক্রমপুরের দিকে পলায়ন করেন। মোহাম্মদ বখতিয়ার পরে লক্ষণাবতী ও অন্যান্য রাজ্য জয় করে তাঁর নিজের নামে 'খোৎবা' পাঠের প্রচলন করেন এবং মুদ্রাঙ্কন করেন। যে সমস্ত মুসলমান তাঁর সংগে এসেছিলো এবং সময় সময় যে মুসলমানেরা এসে তাঁর সংগে মিলিত হয়েছিলো, তিনি তাদের সকলকেই তাঁর নতুন বিজিত রাজ্যে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন।[১]

স্যার ডব্লিউ. হান্টার তাঁর Statistical Accounts of Dacca নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে বরেন্দ্র ও রাঢ় প্রদেশগুলি ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের কর্তৃক বিজিত হয় এবং বংগদেশ নামে অভিহিত পশ্চিমাঞ্চলটি মোহাম্মদ তোঘলক শাহ্ কর্তৃক বিজিত হয়। তিনি যথাক্রমে গৌড়, সাতগাঁ ও সোনারগাঁ তাঁর প্রশাসনিক কর্মস্থলে পরিণত করেন।

১ মালিক বখতিয়ার কসবা দেওগড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং সে জেলায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্কর ভূমি দান করেন। —সুবাহ বিহারের ইতিহাস থেকে

ঐ সময় থেকে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলার প্রথম মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো এবং এদেশ মুসলমান অধিবাসীদের [১] দ্বারা পূর্ণ হতে লাগলো ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬০ বছর সময়কালের জন্যে এদেশে মুসলমানদের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত গতিতে বজায় ছিলো।

১ ডক্টর বুকানন মনে করেন যে বাংলার হিন্দু যুবরাজগণ তাঁদের রাজ্যের পশ্চিমাংশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বহুকাল পরেও সোনার্গাঁয়ে তাঁদের শাসন পরিচালনা করেছিলেন এবং ফরিদ উদ্দীন স্থর শেরশাহের সময় পর্যন্ত প্রদেশের এ অংশ মুসলমান বিজেতাদের রাজ্যের সংগে সংযোজিত হয়নি।

কিন্তু একথা সুবিদিত যে শেরশাহের পূর্ববর্তীকালেও বাংলার পূর্বাংশে মুসলমান শাসক ছিলেন এবং ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব থেকেই সোনারগাঁ তাঁদের অধীনস্থ ছিলো। বস্তুতঃ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক এদেশ বিজয়ের বহু আগেও বাংলার এই অংশে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকা বিচিত্র নয়। আমরা জ্ঞাত হয়েছি যে, বসরার আরব বণিকগণ আট শতক কিংবা তার পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ও চীনের সংগে ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো। বাণিজ্য উপলক্ষে তারা যেসব দেশে গিয়েছে, তাদের অনেকেই সেসব দেশে বসতি স্থাপন করেছে। প্রাচ্যের সেই সময়কার মুসলমান বণিকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর রবার্টসন বলেছেন: 'ক্যাণ্টন সহরে তারা সংখ্যায় এতো বেশী ছিলো যে সম্রাট (আরব দেশীয় লেখকদের বর্ণনানুযায়ী) তাদেরকে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে কাজি বা বিচারক নিযুক্ত করার অনুমতি দিয়েছিলেন; এই কাজি তাঁর দেশবাসীদের মধ্যেকার বিরোধ তাদের নিজস্ব আইনের সাহায্যে নিষ্পত্তি করতেন এবং সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতেন। অন্যান্য স্থানে

মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির শাসনকাল থেকে কদর খানের শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা দিল্লী সম্রাটের শাসনাধীন ছিলো। এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর সম্রাট বাংলা শাসনের জন্য ভাইসরয় নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফখরুদ্দীনের অধীনে বাংলা একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। সুলতান ফখরুদ্দীন চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকার করেন এবং নিজেকে একটি স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের নিকট বাংলার শাসক দাউদ খানের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত এদেশ তার পূর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছিলো।

ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিতো এবং প্রায় প্রতিটি সামুদ্রিক বন্দরে আরবী ভাষা বোধগম্য ছিলো ও এ ভাষায় কথাবার্তা চলতো' (রবার্টসনের Ancient India, পৃঃ ১০২ দ্রষ্টব্য)। এ ঘটনা থেকে বিশ্বাস করার হেতু রয়েছে যে এই প্রাথমিক যুগে বাংলা ছিলো মুসলমান বণিকদের ঔপনিবেশ ভূমি। প্রাচীনকাল থেকে এদেশ পাশ্চাত্য দেশগুলির সংগে ব্যাপকভাবে যে বাণিজ্য চালাতো, এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যে খুব বেশী ছিলো এবং সর্বোপরি নয় শতকের দু'জন মুসলমান পর্যটক এদেশ সম্পর্কে যে স্পষ্ট মন্তব্য করে গেছেন তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। তাঁরা এই ভূভাগকে উল্লেখ করেছেন 'রাখি নামক রাজার দেশ হিসেবে যাঁর অধিকারে বহু সংখ্যক হাতী ছিলো। এর প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিলো সূতীবস্ত্র (ঢাকাই মসলিন), সুহকুমারী কাঠ (অগুরু কাঠ), নকুল জাতীয় প্রাণীর চামড়া (ভোঁদড়ের চামড়া) এবং গণ্ডারের শিং, যেগুলির সমস্তই শঙ্খের (কড়ির) বিনিময়ে কেনা হতো, যা ছিলো এদেশের প্রচলিত মুদ্রা'।' —এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল. ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যার ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ সময় থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দেশ দিল্লীর সম্রাটদের কর্তৃত্বাধীনে ছিলো এবং দিল্লীর রাজদরবার বাংলার নাযিম নিযুক্ত করতো। কিন্তু এই অন্তর্বর্তী কালের মধ্যেও দিল্লীর সম্রাট মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে ইরানের বাদশাহ নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করলে তখনকার বাংলার সুবাদার শুজা খান দিল্লীর প্রতি তাঁর আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করেন এবং স্বাধীনতা লাভ করেন। এদেশ ইংরেজদের হস্তগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার এই স্বাধীনতা বলবৎ ছিলো।

এই ৫৬১ বছর সময়কাল অর্থাৎ এদেশে মুসলমান বিজেতাদের আগমন থেকে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে দিল্লীতে কয়েকটি মুসলমান রাজবংশ তাঁদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম পর্যায়ে (যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন) এদেশ শাসন করেন ঘোরি রাজবংশ, যা কায়কোবাদের রাজত্বকালে লোপ পেয়ে যায়। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে খিলজি রাজবংশ পূর্বোক্ত রাজবংশের উত্তরাধিকারী হন, আবার ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের স্থান অধিকার করেন তুঘলক রাজবংশ। এই বংশ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য চালান এবং তাঁদের পর সৈয়দ রাজবংশ এদেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী হন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মুগল রাজবংশ বা তৈমুরের বংশধরগণ সৈয়দ রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হন।

পর পৃষ্ঠায় বাংলার সুবাদার, রাজা ও নাযিমদের এবং সেইসংগে দিল্লীর সম্রাটদেরও একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হলো।

বাংলার সুবাদার, স্বাধীন রাজা ও নাযিমদের এবং দিল্লীর সম্রাটদেরও একটি কালানুক্রমিক তালিকা :

খ্রিস্টাব্দ	হি: সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১২০৩	৬০০	মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি (তিনি গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন)।	কুতুবউদ্দীন আইবেক
১২০৫	৬০২	মোহাম্মদ শিরিন, আয়েযউদ্দীন খিলজির নাম ধারণ করে ছিলেন।	কুতুবউদ্দীন আইবেক
১২০৮	৬০৫	আলি মর্দান খান খিলজি	ঐ
১২১২	৬০৯	হিশামউদ্দীন হোসাইন, সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজি নাম ধারণ করেছিলেন। তাঁর নিজের নামে খোৎবা পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লক্ষণাবতী রাজ্যে তাঁর নিজের নামে মুদ্রাঙ্কন করেছিলেন।	আরাম শাহ, কুতুবউদ্দীন আইবেকের পুত্র
১২২৭	৬২৪	নাসিরউদ্দীন শাহ, সুলতান শামসুদ্দীন আলতমাসের পুত্র	শামসুদ্দীন আলতমাস
১২২৯	৬২৭	ইয্যত-উল-মুলক মালিক আলাউদ্দীন খান	ঐ

খ্রিস্টাব্দ	হি: সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১২৩৭	৬৩৪	আযিযউদ্দীন তোগ্‌রা খান	সুলতানা রাজিয়া, শামসুদ্দীন আলতমাসের কন্যা
১২৪৪	৬৪২	মালিক কারা বেগ তিমুর খান	বাহরাম শাহ, শামসুদ্দীন আলতমাসের পুত্র
১২৪৬	৬৪৪	মালিক সাইফউদ্দীন	সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ, শামসুদ্দীন আলতমাসের পুত্র
১২৫৩	৬৫১	মালিক উযবেক	ঐ
১২৫৭	৬৫৬	মালিক জালালউদ্দীন	ঐ
১২৫৮	৬৫৭	আরসালান খান	ঐ
১২৬০	৬৫৯	তাতার খান, আরসালান খানের পুত্র	ঐ
১২৭৭	৬৭৬	তুঘ্‌রল	সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন

চেংগিজ খানের মুগলবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বৃদ্ধ সুলতান গিয়াসউদ্দীনের ধনসম্পদ নিঃশেষিত হওয়ার পর উদার ও বিচক্ষণ তুঘ্‌রল তাঁর নিজের অবস্থাকে শক্তিশালী করেন এবং স্বাধীনতা লাভ করে তাঁর নিজের নামে খোৎবা পাঠের প্রচলন করেন।

এই ঘটনার পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন স্বয়ং বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং তুঘ্‌রলকে হত্যা করে এ রাজ্যের ভার তদীয় পুত্র

বোঘরা খানের ওপর ন্যস্ত করেন। সে সময়ে যে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির প্রায় সবই তিনি বোঘরা খানকে দান করেন; কেবল প্রজননোপযোগী হস্তী ও ধনরত্নাদি নিজের জন্যে নিয়ে যান। তিনি তাঁর পুত্রের মস্তকোপরি রাজকীয় ছত্র স্থাপন করেন, যাঁর নামে তিনি খোৎবা পাঠের প্রচলন করেন এবং মুদ্রাঙ্কন করেন। তিনি বিদায়কালে তাঁর পুত্রকে নিম্নোক্ত উপদেশ দান করে যান—(১) লক্ষণাবতীর শাসনকর্তাকে দিল্লীর সম্রাটের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলবে না, তা সেই শাসনকর্তা সম্রাট পরিবারেরই হোন কিংবা অন্য যে কোন পরিবারেরই হোন; দিল্লীর সম্রাট যখন লক্ষণাবতীর ওপর দিয়ে অগ্রসর হবেন তখন এর শাসনকর্তাকে কোন নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে; এবং সম্রাট যখন এদেশ ত্যাগ করবেন তখন তিনি তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে আসবেন এবং স্বীয় প্রজাদের উন্নতি-বিধানে আত্মনিয়োগ করবেন। (২) স্বীয় প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাঁকে ধৈর্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; অর্থাৎ তাঁকে এতো অল্প রাজস্ব ধার্য করা চলবে না যাতে অনমনীয় করদাতাগণ দ্বিধা করতে সাহসী হয়; কিংবা তিনি এতো অধিক রাজস্ব দাবি করবেন না যাতে প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এক কথায় তিনি এমন রাজস্ব ধার্য করবেন যা পরিশোধ করতে জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে না হয়। (৩) বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ পরিষদ সদস্যদের পরামর্শ ব্যতীত কোনো সরকারী কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলবে না। (৪) মিলিশিয়া বাহিনীকে উপেক্ষা করা চলবে না। (৫) যেসমস্ত সংসারত্যাগী লোক আল্লার কাজে নিযুক্ত, তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেয়া চলবে না। এভাবে পরামর্শ দান করে গিয়াসউদ্দীন

বলবন বাংলা শাসনের জন্য তাঁর পুত্রকে রেখে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ৬৮৬ হিজরিতে এই সম্রাটের মৃত্যুর পর দিল্লীর দরবারের আমিরগণ সুলতান নাসিরউদ্দীনের পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। ৬৮৮ হিজরিতে সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোয শাহ নামক দিল্লীর দরবারের একজন উচ্চপদস্থ আমির কায়কোবাদকে হত্যা করে অন্যায়রূপে সিংহাসন অধিকার করেন। ঐ সময় থেকে দিল্লী সাম্রাজ্য ঘোরি রাজবংশের হাত থেকে খিলজি রাজবংশের হাতে চলে যায়। তথাপি বাংলার বোঘ্রা খানের রাজত্বকাল ৭২৫ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে পর পর কয়েকজন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; যথা -(১) জালালউদ্দীন ফিরোয শাহ খিলজি; (২) আলাউদ্দীন খিলজি; (৩) আলাউদ্দীনের পুত্র শাহাবুদ্দীন; (৪) সুলতান কুতুবউদ্দীন মোবারক শাহ খিলজি, (৫) সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ এবং (৬) মোহাম্মদ তুঘলক শাহ। বোঘ্রা খান বাংলায় চুয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১২৮২	৬৮১	বোঘ্রা খান, সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র; তিনি সুলতান নাসিরউদ্দীন নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন
১৩২৫	৭২৫	মালিক বেদাদ খিলজি, কদর খান নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক, সুলতান গিয়াসউদ্দীনের পুত্র

সুলতান নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক কদর খানকে লক্ষণাবতীর সিংহাসনে বসান।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৪০	৭৪১	সুলতান ফখরউদ্দীন	সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক।

সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার জন্যে এবং বারংবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার ফলে দিল্লী সাম্রাজ্য দুর্বল এবং অংগহানি হওয়ার সুযোগে মালিক ফখরউদ্দীন নামক কদর খানের একজন আমির তাঁকে হত্যা করে সুলতান ফকরউদ্দীন নাম ধারণ করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৪৩	৭৪৪	হাজি ইলিয়াস, সুলতান শামসউদ্দীন ভাংরা নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক

ফখরউদ্দীন আলী মোবারক কর্তৃক নিহত হন। এই আলী মোবারক মাত্র অল্প সময়ের জন্য সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, কিন্তু পর্যায়ক্রমে তিনিও হাজি ইলিয়াসের হাতে নিহত হন। হাজি ইলিয়াস সে রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি আলী মোবারককে হত্যা করে সুলতান শামসউদ্দীন নাম ধারণ করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন এবং বাংলায় একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দূরদর্শী শাসনাধীনে এদেশ

যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এহেন উন্নতির মূলে আরো একটি কারণ সক্রিয় ছিলো। সে সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকায় বহু সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবার দেশ ত্যাগ করে বাংলায় এসে বসবাস করতে থাকেন। হাজি ইলিয়াসের শাসন-কাল ছিলো দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ এবং তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৫৮	৭৬০	সুলতান সিকান্দর, শামসউদ্দীন ভাংরার পুত্র	সুলতান ফিরোয শাহ্ বারবক, সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলকের ভ্রাতুষ্পুত্র

বাংলায় এই রাজার শাসনকাল ছিলো আভ্যন্তরীণ শাসন ও বৈদেশিক সম্পর্ক—এই উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৬৭	৭৬৯	সুলতান গিয়াসউদ্দীন, সুলতান সিকান্দরের পুত্র	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ছিলেন একজন ধর্মীয় নীতিবান, ন্যায়-পরায়ণ ও সরল মেজাজের অধিকারী শাসক। তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়, শিক্ষিত ও ধার্মিক লোকদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিভিন্ন দেশের গুণবান ও প্রতিভাশালী লোকদেরকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর রাজধানীতে এবং সিরাজনগরের প্রসিদ্ধ কবি হাফিযকে তাঁর লক্ষ্ণাবতীর দরবারে আনার জন্যে দূত প্রেরণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৭৩	৭৭৫	সাইফ উদ্দীন, গিয়াস উদ্দীনের পুত্র ; তিনি সুলতান-উস্-সালাতিন খেতাব ধারণ করেছিলেন।	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

সুলতান গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর পর আমিরগণ সাইফ উদ্দীনকে সিংহাসনে বসান এবং তাঁকে সুলতান-উস্-সালাতিন খেতাব দান করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৮৩	৭৮৫	সুলতান শামস উদ্দীন, সুলতান-উস্-সালাতিনের পুত্র।	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

এই রাজা ছিলেন দয়ালু, উপকারী ও সাহসী। তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষদের সিংহাসনে বসে তাঁদের আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী রাজ্য শাসন করেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক রাজা কংসের হাতে নিহত হন। রাজা কংস রাজ্যের একজন আমির ছিলেন। সুলতান শামসউদ্দীনকে নিহত করে তিনি বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৮৫	৭৮৭	রাজা কংস (গনেশ)	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

রাজা কংস মুসলমানদের প্রতি নৃশংস আচরণ করেন এবং ধার্মিক ও শিক্ষিত লোকদেরকে হত্যা করেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার

সহিত শেখ বদরেদ-উল-ইসলাম আব্বাসীর হত্যাকাণ্ড ঘটান। তাছাড়া তিনি কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোককে নৌকায় আরোহণ করিয়ে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। রাজার এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য নিষ্ঠুর আচরণ হজরত নূর কুতবে আলমের ধৈর্যচ্যুতি ও কঠোরতার কারণ ঘটালো। হজরত নূর কুতবে আলম ছিলেন পরলোকগত রাজা এবং তাঁর মুসলমান প্রজাদের আধ্যাত্মিক নেতা; তিনি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কিকে বাংলা আক্রমণের জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। তখন রাজা নিজে এই ধর্মীয় নেতার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলেন এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা করলেন যে তাঁর পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেয়া হোক এবং সিংহাসনে বসানো হোক। ধর্মীয় নেতা তখন তাঁর পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম রাখেন জালাল উদ্দীন এবং তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৯২	৭৯৪	সুলতান জালাল উদ্দীন, রাজা কংসের পুত্র	সুলতান নাসির উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ, সুলতান ফিরোজ শাহের পুত্র

যে সমস্ত জ্ঞানী ও ধার্মিক লোক জালাল উদ্দীনের পিতার নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়নের জন্যে রাজধানী থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, জালাল উদ্দীন তাঁদেরকে পুনরায় একত্র করেন এবং তাঁদেরকে প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর শাসনকালে সরকার সবিশেষ স্থায়িত্ব ও শক্তি অর্জন করে। তখন পাণ্ডুয়া সহর

উন্নতির এমন স্তরে পৌঁছেছিলো যে ভারতের অন্য কোনো সহরই তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি।

খ্রিস্টাব্দ	হি: সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪০৯	৮১২	সুলতান আহমদ শাহ, জালাল উদ্দীন শাহের পুত্র	সুলতান মাহমুদ শাহ, সুলতান নাসির উদ্দীন শাহের পুত্র

আহমদ শাহ ছিলেন একজন ভয়ানক অত্যাচারী রাজা এবং তিনি মানুষকে যথেচ্ছাপূর্বক নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতেন; ফলে জনসাধারণ ভীষণভাবে হয়রানিতে ভোগতো এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠলো। অবশেষে আহমদ শাহের দরবারের দুজন আমির, কদর খান ও নাসির খান একত্রে মিলে তাঁকে হত্যা করেন এবং নাসিরখান সিংহাসন অধিকার করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হি: সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪১৬	৮৩০	সুলতান নাসির উদ্দীন শাহ	সুলতান মুয়েয উদ্দীন মোবারক শাহ, খিযির খানের পুত্র

আহমদ শাহের আমিরগণ নাসির খানকে হত্যা করেন এবং সুলতান শামস উদ্দীন ভাংরার একজন বংশধর সুলতান নাসির উদ্দীনকে সিংহাসনে বসান। আমিরগণ অনুসন্ধান করে তাঁকে একটি গ্রামে দেখতে পান, যেখানে তিনি কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি একজন স্বদেশ-হিতৈষী শাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন এবং রাজা কংস, জালাল উদ্দীন ও আহমদ শাহের শাসনামলে যে সমস্ত সভাসদ চলে গিয়েছিলেন

তাঁদেরকে পুনরায় রাজধানীতে একত্র করেন। তাঁর চমৎকার গুণাবলীর সুখ্যাতির কথা বিভিন্ন রাজ্যের লোকদেরকে তাঁর রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিলো এবং তাঁর কোমল ও প্রজাহিতকর শাসনাধীনে সর্বশ্রেণীর মানুষই সমৃদ্ধ ও সুখী হতে পেরেছিলো। তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বত্রিশ বছর কাল রাজত্ব করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪৫৭	৮৬২	বারবক শাহ, নাসির উদ্দীন শাহের পুত্র	সুলতান বহ্‌লুল লুদি

তিনিও একজন চমৎকার শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে তাঁর প্রজা ও সেনাদল উভয়েই সুখী ও সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিলো।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৭৭৪	৮৭৯	সুলতান ইউসফ শাহ, বারবক শাহের পুত্র	সুলতান বহ্‌লুল লুদি

সুলতান ইউসফ শাহ ছিলেন শান্ত মেজাজের অধিকারী এবং প্রজাহিতৈষী শাসক; তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সুশিক্ষিত ও ধার্মিক। তিনি বিচারকার্য সমাধার বেলায় ইসলামী আইন মোতাবেক কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৭৮২	৮৮৭	সুলতান ফতেহ্‌ শাহ ইউসফ শাহের পুত্র	সুলতান বহ্‌লুল লুদি

ফতেহ্‌ শাহ ছিলেন শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ শাসক। তিনি পূর্ববর্তী শাসনকর্তার রীতি ও প্রথানুযায়ী এদেশ শাসন করেন।

সুলতান শাহ্যাদা নামে একজন খোজা ক্রীতদাস তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪৯১	৮৯৬	সুলতান শাহ্যাদা, সুলতান বারবক নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান সিকান্দর, বহ্লুল লুদির পুত্র

সুলতান বারবক বংশগত আমিরদেরকে তাড়িয়ে দেন এবং তাঁদের পরিবর্তে নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে নিয়ে তাঁর দরবার পূর্ণ করেন। মালেক অন্ধল নামে একজন হাবসী তাঁকে হত্যা করেন এবং সিংহাসন অধিকার করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪৯১	৮৯৭	মালেক অন্ধল, ফিরোয শাহ্ নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান সিকান্দর

ফিরোয শাহের ন্যায় ও প্রজাহিতকর শাসনাধীনে জনসাধারণ তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা ভোগ করেছিলো এবং প্রজা ও সৈন্যদল উভয়েই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলো। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুবরণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪৯৪	৮৯৯	সুলতান মাহমুদ শাহ, ফিরোয শাহের পুত্র	সুলতান সিকান্দর

সিদি বদর নামক জনৈক হাবসী মাহমুদ শাহকে হত্যা করে বাংলার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪৯৫	৯০০	হাবসী সিদি বদর, সুলতান মুযাফ্ফর শাহ নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান সিকান্দর

দেশের পণ্ডিত ব্যক্তি, অভিজাত সম্প্রদায় ও ধার্মিক লোকেরা মুযাফ্ফর শাহের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে তিনি তাঁদের সবাইকে হত্যা করেন। অবশেষে তাঁর উযির সৈয়দ শরিফ মক্কী অন্যান্য আমিরের সহযোগিতায় তাঁকে হত্যা করেন এবং রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৪৯৮	৯০৩	সৈয়দ শরিফ মক্কী, সুলতান আলাউদ্দীন নাম ধারণ করেছিলেন এবং হোসেন শাহ বাদশাহ্ খেতাবে পরিচিত ছিলেন।	সুলতান সিকান্দর

এই রাজা ছিলেন যথার্থ মেজাজের অধিকারী এবং সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিপোষক। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের এবং অভিজাত আমিরদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। তিনি ধার্মিক লোক, সৈয়দ এবং উচ্চ বংশীয় মোগল ও আফগানদেরকে তাঁর রাজ্যের কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনি হাবসী সুলতানদের কৃত অনিষ্টকর কাজের প্রতিকার করেন এবং

দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর বিচক্ষণ শাসন ব্যবস্থাধীনে বাংলাদেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। তিনি ধার্মিক লোক, সৈয়দ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক নেতাকে বহুসংখ্যক নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং পুণ্যাত্মা সিদ্ধপুরুষ নূর কুতুবে আলমের পবিত্র আস্তানার জন্যে অনেকগুলি গ্রামের রাজস্ব বৃত্তি হিসেবে দান করেন। দীর্ঘকাল শাসনের পর তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে তারমিয নগরের অধিবাসী সৈয়দ শরিফ মক্কী তদীয় ভাই সৈয়দ ইউসফ ও পিতা সৈয়দ আশরফ মক্কীর সংগে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং এই তিনজন একসংগে রাঢ় অঞ্চলের চান্দপুর নামক মৌজায় তাঁদের বসতি স্থাপন করেন। এখানে সৈয়দ শরিফ মক্কী সেখানকার কাযির শিক্ষকতায় তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন বলে কাযি সাহেব স্বীয় কন্যাকে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। তিনি পরে মুযাফ্ফর শাহের দরবারে গিয়ে হাজির হন। মুযাফ্ফর শাহ্ তাঁকে তাঁর উযির নিযুক্ত করেন। উক্ত রাজাকে হত্যা করার পর দরবারের আমিরগণ তাঁকে সিংহাসনে বসান।

খ্রিস্টাব্দ	হি: সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৫২১	৯২৭	সুলতান নুসরৎ শাহ্, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র	সুলতান ইব্রাহিম লুদি, সিকান্দর লুদির পুত্র

এই রাজার শাসনামলে হুমায়ুন বাদশাহ্ ইব্রাহিম লুদিকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং হিন্দুস্তানের

অধিকাংশ প্রদেশকেই তাঁর কর্তৃত্বাধীনে আনেন। অতএব সেই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সর্দার ও অভিজাত ব্যক্তি দেশ থেকে পালিয়ে এসে নুসরৎ শাহের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এমনকি নিহত সম্রাটের ভাই সুলতান মাহমুদও বাংলায় পালিয়ে আসেন এবং তাঁর পদ ও মর্যাদার উপযোগী জীবনধারণের জন্য কয়েকটি গ্রাম ও পরগণার মঞ্জুরি লাভ করেন। এই শরণার্থীর সংগে ইব্রাহিম লুদির কন্যাও আগমন করেন এবং নুসরৎ শাহের মহিষীরূপে অধিষ্ঠিতা হন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৫৩৪	৯৪০	সুলতান মাহমুদ শাহ বাংগালী, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র	হুমায়ুন বাদশাহ্‌
১৫৪১	৯৪৬	খিযির খান	শেরশাহ্‌ বাদশাহ্‌

শেরশাহ হুমায়ুনকে দিল্লী থেকে বহিষ্কৃত করেন এবং হিন্দুস্তানের সম্রাট হন। তিনি সুলতান মাহমুদ বাংগালীর হাত থেকে বাংলার সার্বভৌম ক্ষমতা বলপূর্বক কেড়ে নেন এবং এর শাসনকর্তারূপে খিযিরকে নিযুক্ত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৫৪৫	৯৫২	মোহাম্মদ খান সুর	সলিম বাদশাহ্‌
১৫৫৫	৯৬২	বাহাদুর শাহ্‌ সলিম খান	মোহাম্মদ শাহ্‌ আদিল
১৫৬০	৯৬৮	জালালউদ্দীন শাহ	ঐ
১৫৬৪	৯৭১	সোলেমান শাহ কররানি আফগানি	ঐ

সোলেমান শাহ্ বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৫৭৩	৯৮১	দাউদ শাহ, সুলেমান শাহের পুত্র	জালালউদ্দীন আকবর বাদশাহ্

এই শাসকের শাসনামলেই আকবর বাদশাহ্ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ জয় করে এটাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

মোগল রাজবংশের অধীনে বাংলার সুবাদারগণ

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৫৭৬	৯৮৪	নওয়াব খান জাহান	জালালউদ্দীন আকবর বাদশাহ্

খান জাহান দাউদ খানকে বন্দী করেন এবং দাউদ খানকে হত্যা করা হয়। খান জাহানের শাসনাধীনে বাংলা ও বিহার আকবরের নিয়মিত কর্তৃত্বাধীনে আসে। তিনি বাংলার রাজধানী তাণ্ডা থেকে পুনরায় গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৫৭৯	৯৮৭	মুযাফ্ফর খান	জালালউদ্দীন আকবর
১৫৮০	৯৮৮	রাজা তোদরমল	ঐ
১৫৮২	৯৯০	খানে আযম	ঐ
১৫৮৪	৯৯২	শাহ্বায খান	ঐ
১৫৮৯	৯৯৭	রাজা মানসিংহ	ঐ

রাজা মানসিংহ রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৬০৬	১০১৫	কুতুবউদ্দীন খান	জাহাংগীর বাদশাহ্
১৬০৭	১০১৬	জাহাংগীর কুলি খান	ঐ
১৬০৮	১০১৭	শেখ ইসলাম খান	ঐ

ইসলাম খান রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৬১৩	১০২২	কাসেম খান, ইসলাম খানের পুত্র	জাহাংগীর বাদশাহ্
১৬১৮	১০২৮	ইব্রাহিম খান ফতেহ্ জংগ	ঐ
১৬২২	১০৩২	শাজাহান, জাহাংগীরের পুত্র	ঐ
১৬২৫	১০৩৩	খানে নওয়ায খান	ঐ
১৬২৬	১০৩৫	নওয়াব মুকর্‌রম খান	ঐ
১৬২৭	১০৩৬	নওয়াব ফিদাই খান	ঐ
১৬২৮	১০৩৭	নওয়াব কাসিম খান	শাজাহান বাদশাহ্
১৬৩২	১০৪২	নওয়াব আযম খান	ঐ
১৬৩৭	১০৪৭	নওয়াব জোলাম খান মাশহাদি	ঐ
১৬৩৯	১০৪৯	শাহযাদা সুলতান মোহাম্মদ শুজা, শাজাহানের পুত্র	ঐ
১৬৬০	১০৭০	নওয়াব মীরজুমলা	আওরংগজেব বাদশাহ্
১৬৬৪	১০৭৪	নওয়াব শায়েস্তা খান	ঐ
১৬৭৭	১০৮৭	নওয়াব ফিদাই খান	ঐ
১৬৭৮	১০৮৮	শাহযাদা সুলতান মোহাম্মদ আযম	ঐ

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৬৮০	১০৯০	নওয়াব শইস্তা খান	আওরংগজেব বাদশাহ্
১৬৮৯	১০৯৯	নওয়াব ইব্রাহিম খান সানি (২য়)	ঐ
১৬৯৭	১১০৮	শাহযাদা আযিম-উশ্-শান	ঐ
১৭০৪	১১১৬	নওয়াব মুর্শিদ কুলি খান	ঐ

মুর্শিদ কুলি খান রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৭২৫	১১৩৯	নওয়াব শুজা-উদ্দীন মোহাম্মদ খান	মোহাম্মদ শাহ বাদশাহ্

দিল্লী সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে নওয়াব শুজা-উদ্দীন অবিমিশ্র ক্ষমতার অধিকারী হন এবং তাঁর নিজের সুবিধা মতো বাংলাদেশ শাসন করতে থাকেন। এসময় বাংলা পুনরায় স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৭৩৯	১১৫১	নওয়াব সরফরাজ খান, শুজা-উদ্দীন খানের পুত্র	মোহাম্মদ শাহ্ বাদশাহ্
১৭৪০	১১৫৩	নওয়াব আলিবর্দি খান	ঐ
১৭৫৬	১১৭০	নওয়াব সিরাজ-উদ্দৌলা	দ্বিতীয় আলমগীর
১৭৫৭	১১৭১	নওয়াব মীর মোহাম্মদ জাফর খান	ঐ
১৭৬৪	১১৭৮	নওয়াব নাজ্ম-উদ্দৌলা	শাহ্ আলম

আমরা এখন মূল বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে পারি। সুদীর্ঘকাল বাংলা দেশ মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিলো : এই শাসনামলে এদেশ হিন্দুস্তানের যে কোনো অঞ্চল কিংবা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বের যেকোনো মুসলমান দেশ থেকে অধিকতর পরিমাণে শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করেছিলো। অধিকন্তু এখানে মুসলমানগণ নিজেরাই ছিলো শাসক। পুনশ্চ, যে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা এদেশ ছিলো সুরক্ষিত, সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে এদেশ সর্বদাই বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলো।[১] তাছাড়া বাংলার জমির উর্বরতা ও এর উৎপাদিত ফসলের প্রাচুর্য অন্যান্য দেশের লোকদেরকে এখানে বসতি স্থাপনের জন্যে আকৃষ্ট করেছিলো। এ সমস্ত কারণে বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এভাবে এ প্রদেশেই ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশ থেকে অধিক সংখ্যক মুসলমান বসতি স্থাপন করে।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬২ বছর সময় কালের জন্যে ৭৬ জন মুসলমান সুবাদার, রাজা ও নাযিম ক্রমাগতভাবে বংগদেশ শাসন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১১ জন সুবাদার ঘোরি ও খিলজি সম্রাটদের হাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন, ২৬ জন ছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা ; এঁদের মধ্যে শের-শাহের রাজত্বকালের সমসাময়িক শাসকগণও ছিলেন এবং অবশিষ্ট ৩৪ জন ছিলেন মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ নাযিম। এই ৫৬২ বছর সময়কালের মধ্যে যে ৭৬ জন শাসক এদেশ শাসন করেছেন তাঁদের মধ্যে কংস, জালাল উদ্দীন শাহ, আহমদ শাহ, রাজা তোডরমল ও রাজা মানসিংহ ব্যতীত বাদবাকী সবাই ছিলেন

১. Hamilton's 'Hindoostan and Reazus-Salatin.'

আফগান, মোগল, পারসিক কিংবা আরব বংশের লোক। বাংলার এই শাসকগণ বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের মুসলমানই বহু সংখ্যায় আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, ইরান, আরব ও ভারতবর্ষের দূরবর্তী অঞ্চল এবং অন্যান্য দেশ থেকে বাংলায় আগমন করে ও বসতি স্থাপন করে। এই মুসলমানদের কেউ কেউ এসেছিলো বিজেতাদের সংগে, কেউ কেউ এসেছিলো তাদের জন্মভূমির নানা উপদ্রব ও বিদ্রোহের কারণে এবং কেউ কেউ এসেছিলো চাকরি বা জীবিকার অন্বেষণে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশ বা ভূখণ্ড থেকে এদেশে মুসলমানদের সমাগম সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি আমি করেছি সেগুলির সমর্থনে আমি এখানে এই সমাগমের কারণ স্বরূপ বিভিন্ন ইতিহাসে বর্ণিত কতিপয় ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করতে পারি।

যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলা দেশ জয় করেন, তখন বহু সংখ্যক আফগান, মোগল ও পদাতিক সৈন্য তাঁর সংগে এদেশে আগমন করেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন আফগান সর্দার। তিনি অগণিত মুসলমান সৈন্যসহ বাংলা ও বিহার অধিকার করেন এবং এ সমস্ত রাজ্যে মুসলমান শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি তাঁর আমীর ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে জায়গীর মঞ্জুর করেন এবং এভাবে এই সদ্যবিজিত রাজ্যগুলিতে তাঁদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজি নামধারী হিশাম উদ্দীন হোসেন ১১১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বংগদেশ শাসন করেন। তিনি মুসলমান অভিজাত ও ভদ্র সম্প্রদায়, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকদের প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। তাঁর শাসনামলে অন্যান্য দেশ থেকে বহু মুসলমান বাংলায় আগমন করে। তিনি

সৈয়দ, ধর্মপ্রচারক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আয়মা ও নিষ্কর ভূমি দান করে তাঁদেরকে তাঁর রাজ্যে বসতি স্থাপনের বন্দোবস্ত করে দেন। মৌলানা সিরাজ উদ্দীন সিরাজী এই শাসনকর্তা সম্পর্কে তাঁর 'তবাকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন—

'মালিক হিশাম উদ্দীনের জনহিতকর কার্যাবলী এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে তাঁর নামেই লক্ষণাবতী রাজ্যের মুদ্রা তৈরী হতো এবং তাঁর নামেই খোৎবা পাঠ করা হতো এবং তাঁরা তাঁকে সুলতান গিয়াস উদ্দীন নামে অভিহিত করতেন। তিনি লক্ষণাবতী নগরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন ··· ··· এবং চতুর্দিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ হয়।

তিনি ছিলেন এমন একজন লোক যার চালচলন ছিলো প্রীতিকর, মুখাবয়ব ছিলো অত্যধিক সুন্দর এবং দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই তিনি ছিলেন সৎগুণাবলীর পূর্ণতায় অলঙ্কৃত; তাঁর উদারতা ও অনুগ্রহের জন্যে সকলেই উপকৃত হতেন এবং বহু দান লাভ করতেন। সে দেশে তাঁর সদাশয়তার বহু নিদর্শন রয়েছে। তিনি 'জামে' (প্রধান মসজিদ) ও অন্যান্য মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সৎলোক, ধর্মতত্ত্ববিদ, মসজিদের ইমাম ও রসুলের বংশধরদেরকে বেতন ও ভাতা দান করেন। ··· ···৬৪১ হিজরিতে এই কথাগুলির লেখক যখন লক্ষণাবতী রাজ্যে পৌঁছেন, তখন তিনি সে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উক্ত রাজার উৎকৃষ্ট কাজগুলির নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে পান।'

হিন্দুস্তানের সম্রাট সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র এবং সুলতান শামসউদ্দীন আলতমাসের কন্যাপক্ষীয় পৌত্র সুলতান নাসিরউদ্দীন নামে অভিহিত বোঘ্‌রা খান ১২৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪৫ বছরের জন্যে বংগদেশ শাসন করেন।

তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিপোষক, গুণগ্রাহী ও মানুষের চরিত্রের যথার্থ বিচারক। কবি আমির খসরু তাঁর প্রশংসা করে অনেক কবিতা লিখেছেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পর বোঘ্‌রা খানের পুত্র ময়েযউদ্দীন কায়কোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি নিজে বাংলায় তাঁর শাসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। কায়কোবাদ নিজেকে বিলাসিতায় ও ইন্দ্রিয় সেবায় নিয়োজিত করলেন এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজানুগত্যহীন ও অনিষ্টকর সভাসদগণ কায়কোবাদের চূড়ান্ত উৎখাতের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর শক্তি খর্ব করার জন্যে এ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তাই তাঁরা অনুগত আমির ও রাজপ্রাসাদের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে উৎপীড়ন করার জন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে প্ররোচিত করতে লাগলেন। অবশেষে ফল হলো এই যে, সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোয শাহ খিলজি নামে রাজ্যের একজন আমির কায়কোবাদকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এ ঘটনার ফলে দিল্লীর ঘোরি রাজবংশের শাসনের অবসান হয় এবং রাজ্যের শাসনক্ষমতা খিলজি পরিবারের হাতে চলে যায়। এ ঘটনার পরেও বাংলায় ঘোরি রাজবংশের আধিপত্য অর্থাৎ সুলতান নাসিরউদ্দীন বোঘ্‌রা খানের শাসন অপরিবর্তনীয়ই থেকে যায়। ফলে দিল্লীর ঘোরি রাজবংশের বিশ্বস্ত সমর্থকগণ প্রথমতঃ কায়কোবাদের উৎপীড়নের জন্যে এবং শেষে তাঁর সরকার উৎখাতের জন্যে বাংলার দিকে পলায়ন করেন এবং বোঘ্‌রা খানের আশ্রয়াধীনে নিজেদেরকে ন্যস্ত করেন।

এ ঘটনার কথা ইতিহাসের পাতায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অতএব আমি 'ফিরিশতাহ্‌', 'তবাকাৎ-ই-আকবরী' এবং এ জাতীয়

অন্যান্য ইতিহাসে বর্ণিত এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুই কেবল এখানে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা করছি।

গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দীন বোঘ্রা খানের পুত্র ময়েযউদ্দীন কায়কোবাদ দিল্লীর সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন। সিংহাসনারোহণের পর তিনি তাঁর যৌবনসুলভ ভাবাবেগের রাশ আলগা করে দেন এবং বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়গত আমোদ-প্রমোদে গভীরভাবে মত্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সময়ে চারণ ও ভাঁড় শ্রেণীর লোকেরা যথেষ্ট অনুগ্রহ ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। মালিক নিযাম উদ্দীন তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেতেন; তাঁকেই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় এবং সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা তাঁর হাতেই ন্যস্ত করা হয়। সম্রাটকে এভাবে বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতে এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে দেখে মালিক নিযামউদ্দীন সিংহাসন অধিকারের আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করতে লাগলেন; এই অভিসন্ধি সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ তিনি সম্রাট ও তাঁর আমিরদের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিবাদের বীজ বপন করেন; এবং অধিকাংশ অনুগত ও বিশ্বস্ত আমিরকে (তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করে) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে কিংবা দূরবর্তী ও নির্জন স্থানে তাঁদেরকে নির্বাসিত করে অথবা কারারুদ্ধ করে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ মুক্ত করতে কৃতকার্য হন।

যখন নাসিরউদ্দীন বোঘ্রা খান বাংলাদেশ থেকে তাঁর পুত্রের এহেন খামখেয়ালী আচরণের এবং মালিক নিযামউদ্দীন কর্তৃক প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহারের সংবাদ শুনতে পেলেন তখন তাঁর পুত্রের অসঙ্গত আচরণের জন্যে ভর্ৎসনা করে তাঁর নিকট একটি পত্র লেখেন। তাঁর এই ভর্ৎসনা ও প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়েছে দেখে

তিনি নিজেই দিল্লীর দিকে রওয়ানা হলেন। মালিক নিযামউদ্দীন স্বীয় চক্রান্তের দ্বারা পিতা ও পুত্রের মধ্যে যাতে মিলন না হয় সে চেষ্টায় প্রায় কৃতকার্য হয়েছিলেন ; কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর সে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়নি। অবশেষে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সদ্ভাবসূচক সাক্ষাৎকার ঘটলো। মাত্র কয়েকদিন অবস্থানের পর পিতা তাঁর পুত্রকে কিছু হিতোপদেশ দিয়ে বাংলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুত্রও রাজধানী দিল্লী শহরে গমন করেন। কিন্তু নাসিরউদ্দীন চলে যাওয়ার সংগে সংগেই কায়কোবাদ পিতার সমস্ত হিতোপদেশ বিস্মৃত হন এবং তাঁর পূর্বেকার উচ্ছৃঙ্খল জীবনে পুনরায় ফিরে যান।

নাসির উদ্দীন যখন তাঁর পুত্রের বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় পুনর্বার ফিরে যাওয়ার খবর শুনলেন তখন তিনি তাঁর পুত্রের জীবন ও তাঁর শাসন ক্ষমতার স্থায়িত্ব সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়লেন।

এ সময়ের কিছুকাল পরে মালিক নিযামউদ্দীন বিষ প্রয়োগে নিহত হন এবং কায়কোবাদ অপরিমিত মদ্য পান ও ইন্দ্রিয় সেবার ফলস্বরূপ পক্ষাঘাত ও সন্ন্যাস রোগের শিকারে পরিণত হন। তাঁর অসুস্থতার সময় কিছু সংখ্যক শক্তিশালী আমির সিংহাসন অধিকারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন ; কিন্তু অন্যান্য আমির ক্ষিপ্রতার সহিত একটি মতৈক্যে উপস্থিত হয়ে কায়ুমার্স নামক কায়কোবাদের মাত্র তিন বছর বয়স্ক পুত্রকে হেরেম থেকে এনে সিংহাসনে বসান এবং তাঁর নামকরণ করেন শামসউদ্দীন। তখন আমিরগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন ; খিলজিদের দলটি জালাল উদ্দীন ফিরোয শাহের পক্ষাবলম্বন করেন, আর তুর্কীদের দলটি কায়ুমার্সের পক্ষ সমর্থন করেন।

জালাল উদ্দীন ফিরোয খিলজির পক্ষ সমর্থকগণ কায়ুমার্সের সমর্থকদের গ্রেফতার করেন এবং মৃত্যুপথের যাত্রী কায়কোবাদকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তাঁর মৃত-দেহ যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করেন।

সে সময়েই দিল্লী সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ঘোরি রাজ-বংশের হাত থেকে খিলজি বংশে চলে যায়।

সুলতান ফখর উদ্দীন যখন দিল্লীর সিংহাসনের ওপর থেকে তাঁর আনুগত্য প্রত্যাহার করে বাংলায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এদেশের একচ্ছত্র অধিপতি ও এদেশের রাজস্বের একমাত্র মালিক হন তখন মোহাম্মদ তোগলক ছিলেন দিল্লীর সম্রাট। মুসলমান ধর্মাত্মা ও সৈয়দ, সামরিক ও বেসামরিক বৃত্তিধারী লোকদের উপর সম্রাটের হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর কুখ্যাতি এতোই বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁর নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়নে দেশ এতোই ছেয়ে গেলো যে অগণিত মুসলমান পরিবার হিন্দুস্তান পরিত্যাগ করে আশ্রয়ের সন্ধানে বাংলায় আগমন করে। অধিকন্তু সম্রাটের শাসনকালে দিল্লী ও এর অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে দুবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সেখানকার সমস্ত লোক দুর্ভিক্ষের এই ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় বাংলার দিকে পলায়ন করে। এ সমস্ত ঘটনা যে ঘটেছিলো তার প্রমাণ হিসেবে আমি 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' থেকে নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত করছি—

'অনিষ্টকর কার্য সাধনে, উৎপীড়নে, নিরপরাধদের রক্তপাতে এবং আল্লার বান্দাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন ও নিষ্ঠুর শাসন চালানোর ব্যাপারে সুলতান মোহাম্মদ তোগলক

ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নীতিজ্ঞানবর্জিত। এ ব্যাপারে তিনি যুক্তি ও শরিয়তের আইন এই উভয়ের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, মনে হয় তিনি যেন পৃথিবীকে জনশূন্য করতে চেয়েছেন। এমন একটা সপ্তাহও বাদ যায়নি যখন তিনি একেশ্বরবাদী ধর্মাত্মা, সৈয়দ, সুফি, কালান্দর কিংবা সন্ন্যাসী, লেখক ও সৈনিকদের ওপর নির্যাতন চালাননি এবং রক্তপাত ঘটাননি। চাপা বিদ্রোহানল সর্বত্র জ্বলে উঠে ; দেওঘর ও গুজরাট ব্যতীত দূরবর্তী প্রদেশগুলির একটিও আর সম্রাটের অধিকারে রইলো না। এভাবে উত্তেজিত হয়ে সম্রাট তাঁর প্রজাদের ওপর আরো বেশী নির্যাতন চালাতে লাগলেন। সম্রাটের অত্যাচারের সংবাদ প্রজাদের রোষবহ্নি আরো তীব্রতর করলো, যার ফলে রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ ও অনিষ্টকর ঘটনার সংঘটন দিন দিন বাড়তে লাগলো। অনাবৃষ্টির দরুন সম্রাটের কৃষি-উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচেষ্টা কোনো হিতকর রূপ লাভ করেনি বলে এর অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ তিনি শহরের (দিল্লীর) ফটক-গুলি খুলে দেয়ার জন্যে এবং যে সমস্ত অধিবাসীকে তিনি শহরের অভ্যন্তরে বলপূর্বক আটকিয়ে রেখেছিলেন তাদেরকে মুক্তি দানের জন্যে আদেশ দেন। যারা জীবিত ছিলো তারা তাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাসহ কোনো রকমে বংগদেশে চলে আসে।'

একই বিষয় সম্পর্কে 'তবাকাৎ ই-আকবরি'র গ্রন্থাকার নিম্নরূপ লিখেছেন—

'দূরবর্তী প্রদেশগুলির মধ্যে দেওঘর ও গুজরাট ব্যতীত আর কোনো প্রদেশই সম্রাটের অধিকারে রইলো না এবং বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা সর্বত্রই ঘটতে লাগলো। তার ফলস্বরূপ

মোহাম্মদ তোগলক ক্রোধান্বিত ও বিরক্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর ক্রোধের উগ্রতায় তিনি তাঁর নির্যাতনের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে তুললেন। রাজার নির্যাতনের সংবাদ শুনে জনসাধারণ অতিমাত্রায় রুষ্ট হয়ে উঠলো এবং প্রজাদের এই অসুখী অবস্থা আরো বেশী খারাপ হতে লাগলো। রাজা চাষাবাদ বাড়াতে ও প্রশস্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অনাবৃষ্টির দরুন তাঁর প্রচেষ্টা থেকে (এদিক দিয়ে) কোনো উপকারই পাওয়া যায়নি। অবশেষে প্রয়োজনের তাগিদে তিনি শহরের ফটকগুলি খুলে দেয়ার আদেশ দিতে বাধ্য হন এবং (শহরের মধ্যে) যে অধিবাসীদেরকে বলপূর্বক ও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক রাখা হয়েছিলো তাদেরকে তাদের নিজেদের পছন্দমতো যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে দেয়া হলো। অধিকাংশ লোকই তাদের পরিবার-পরিজন ও পোষ্যদেরকে নিয়ে সে সময়ে বাংলা দেশে এসে আশ্রয় নেয়।

যা হোক, প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে দিল্লী ও এর আশেপাশের এলাকা থেকে জনসাধারণ যে বাংলাদেশে আশ্রয়ের খোঁজে আসেন, 'তারিখ-ই ফিরিশতা'য় (১৩৯ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে তা সুস্পষ্ট হবে—

আমিন-উল-মুল্ক বিভ্রান্তিতে পড়ে ও প্রচণ্ড ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে মনে ভাবলেন 'এ কথা বোঝা কঠিন যে রাজা দাক্ষিণাত্য থেকে তাঁর গৃহশিক্ষক ফতেহ্ কুলি খানকে ডেকে পাঠাতে চান ; ফতেহ্ কুলি খান এ দেশের সবটাই যথার্থভাবে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে এনেছিলেন এবং তাঁর সুযোগ্য শাসনের দ্বারা জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাস করেছিলেন। তাঁকে

ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিলো তাঁকে রাজার নিকটে রাখা এবং তাঁর স্থানে আমাকে পাঠানো। কিন্তু এ ধরনের আদেশের দ্বারা রাজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে আমাকে এসমস্ত এলাকা থেকে সরানো এবং (পরিণামে) আমার ধ্বংস সাধন করা।' এসময়ে এমন একটি ব্যাপার ঘটেছিলো যে, একদল কেরানীকে তহবিল তসরুফের দায়ে সন্দেহ করা হয়েছিলো এবং রাজা তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। কিন্তু তারা অভাবের অজুহাতে দিল্লী পরিত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করলো। অযোধ্যা ও জাফরাবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তারা আমিন-উল্-মুল্কের আশ্রয়াধীনে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করলো। আমিন-উল্-মুল্ক দেখতে পেলেন যে এ কারণে তাঁর প্রতি রাজার মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এই সংকটকালে অবাধ্যতা ও অপরাধকে অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় না দেখে তিনি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন; তিনি রাজার আদেশ অনুসরণের ভান করে সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠান এবং অযোধ্যা ও জাফরাবাদ থেকে তাঁর ভাইকে তলব করেন। তিনি যাঁদেরকে তলব করেছিলেন তাঁরা তখনও তাঁদের পথে ছিলেন; এক রাত্রে আমিন-উল্-মুল্ক সাগর দোয়াবা থেকে বেরিয়ে তাদের সংগে মিলিত হন। তাঁর ভাইয়েরা নির্ভীকতা ও সাহসিকতার পতাকা উত্তোলন করে ৪ হাজার অশ্ব সহ পূর্ণ বেগে সাগর দোয়াবার শহরতলিতে আসেন এবং সন্নিকটস্থ সমভূমিতে বিচরণরত রাজার সমস্ত হাতী ও অশ্বকে তাঁদের সম্মুখস্থ শিবিরের এলাকার দিকে তাড়িয়ে দেন। রাজা এই হতবুদ্ধিকর অবস্থায় অমরোহ, সমনা, কোল ও বরনের সেনাবাহিনীকে তলব করেন এবং দিল্লীর

সেনাবাহিনী নিয়ে খাজা জাহানও রাজার সঙ্গে যোগদান করেন। রাজা যুদ্ধের জন্যে তাঁর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাঁরিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন; আমিন-উল্‌-মুল্‌ক এবং তাঁর ভায়েরাও গংগানদী অতিক্রম করে তাঁর সম্মুখীন হলেন; তাঁদের আশা ছিলো যে, জনসাধারণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন ছিলো বলে তারা এ যুদ্ধে তাঁদের সহযোগিতা করতে পারে। পরদিন তাঁরা কনৌজের সমতলভূমিতে যুদ্ধের জন্যে তাদের সেনাবাহিনীকে নিয়ে ব্যূহ রচনা করেন। রাজা তাঁদের ঔদ্ধত্যে ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে স্বয়ং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। আমিন-উল্‌-মুল্‌ক ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় এ ঘটনার কথা অবগত হয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণের জন্যে আক্রমণ প্রতিরোধ করার পর পলায়ন করেন। স্বয়ং আমিন-উল্‌-মুল্‌ক জীবিত অবস্থায় বন্দী হন। শুকরুল্লাহ খান নামক তাঁর এক ভাই আহত হন এবং তাঁকে গংগার পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁর অপর ভাই পলায়নের সময় মৃত্যুবরণ করেন। (বিদ্রোহী সৈন্যদের) কেউ কেউ তাদের অশ্ব ও সামরিক সাজ-সরঞ্জামসহ সলিল সমাধি লাভ করে এবং যারা অপর তীরে পৌঁছতে সক্ষম হয় তাদের অবস্থা ছিলো মৃতের চাইতেও বেশী শোচনীয়; কেননা তারা ভয়ঙ্কর জলচর জীবের মুখে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং পরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। রাজা ঘোষণা করলেন যে, আমিন-উল্‌-মুল্‌কের কোনো দোষ ছিলো না; কেবল অন্যেরাই তাঁকে একাজে প্ররোচিত করেছিলো। কাজেই তিনি তাঁকে তার সম্মুখে এনে হাজির করেন এবং একটি অশ্ব ও

সম্মানসূচক খেলাত উপহার দিয়ে তাঁকে একটি বৃহৎ এলাকার শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন। এ স্থান থেকে রাজা চলে যান এবং সেখান থেকে খাজা জাহানকে তার আগে আগে লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাওয়ার জন্যে পাঠান; আমিন-উল্-মুল্কের যে সমস্ত সৈন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তারা যাতে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে তজ্জন্য তাদেরকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যেই খাজা জাহানকে পাঠানো হয়েছিলো।

সুলতান শামস উদ্দীন ভাংরা, সুলতান শামস উদ্দীনের পুত্র সুলতান সিকান্দর, সুলতান সিকান্দরের পুত্র সুলতান গিয়াস উদ্দীন, সুলতান নাসির উদ্দীন ও সুলতান বারবকের রাজত্বকালে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়কে অপরিমিত শ্রদ্ধা দেখানো হতো। এ কারণে এবং এই শাসনকর্তাদের অন্যান্য চমৎকার গুণাবলীর জন্যে ভালো ভালো পরিবারের অসংখ্য লোক সময় সময় তাদের দেশ থেকে বাংলায় এসে বসবাস করতে থাকে।[১] এ সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা এই শাসকদের রাজত্বকালের বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে।

সুলতান আলাউদ্দীন নামধারী এবং হাসান শাহ্ নামে সাধারণভাবে অভিহিত মক্কার সৈয়দ শরিফ নিজে একজন অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক ছিলেন এবং শিক্ষায় ও ব্যক্তিগত গুণাবলীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর শাসনামলে বংগদেশ অত্যধিক পরিমাণে সমৃদ্ধ ও উন্নত স্তরে পৌঁছে এবং সর্বশ্রেণীর অগণিত মুসলমান প্রতিটি অঞ্চল ও দেশ থেকে বাংলায় আগমন করে। বিশেষতঃ এই রাজা ভালো ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদেরকে যথেষ্ট সুবিধা

১ History of Bengal: By C. Stewart. p. 72 দ্রষ্টব্য।

দান করতেন। তিনি বাংলার সর্বত্র সৈয়দ মোগল ও আফগানদের উচ্চ কর্মচারীপদে নিযুক্ত করতেন এবং মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে করমুক্ত জমি বণ্টন করে দিতেন। দিল্লীর সম্রাট সুলতান সিকান্দর কর্তৃক পরাজিত ও বিহারের সীমান্ত পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে জামপুরের হোসেন শাহ্ শর্কি লক্ষণাবতী রাজ্যের অন্তর্গত কহলগাঁয়ে পৌঁছলে বাংলার তৎকালীন শাসক আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ তাঁকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য পদ ও মর্যাদার সহিত ভরণপোষণ করেন। তিনি তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার উপকরণের যোগান দিয়েছেন, যাতে ভূতপূর্ব শাসক সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করে তাঁর বাকী জীবন বাংলাদেশে কাটাতে পারেন।[১] সরণের সুবাদার হোসেন খান কিরমিলি নামক আরেকজন মর্যাদাসম্পন্ন শরণার্থী তাঁর সমর্থক ও পোষ্যদের সহ বাংলার রাজা হোসেন শাহের নিকট আশ্রয় নেন। সুলতান সিকান্দর শাহ তাঁর প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করলে তিনি বাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নসরৎ শাহের শাসনকালে রাজা হুমায়ুন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে সম্রাট ইব্রাহিম লুদিকে হত্যা করেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং হিন্দুস্তানের অধিকাংশ ভূভাগের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। শাসনব্যবস্থার এই বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত অবস্থার ফলে রাজ্যের বহু উচ্চপদস্থ ও প্রধান ব্যক্তি সুলতান নসরৎ শাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে বাংলায় পলায়ন করেন। এমন কি নিহত ইব্রাহিম লুদির পরিবারও

১ History of Bengal: By C. Stewart p 74 দ্রষ্টব্য

এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর কন্যা সুলতান নসরৎ শাহের সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। এই ঘটনাবলী 'তারিখ ই-ফিরিশতা'য় এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

> বাদশাহ্ নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ হুমায়ুন যখন সিকান্দর লুদির পুত্র ইব্রাহিম শাহ্ লুদিকে হত্যা করেন ও হিন্দুস্তানের বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর আধিপত্য লাভ করেন, তখন অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত আফগান বাংলায় পলায়ন করেন এবং নসরৎ শাহের আশ্রয়াধীনে নিজেদেরকে স্থাপন করেন। অবশেষে সুলতান ইব্রাহিম লুদির ভাই সুলতান মাহমুদও বাংলায় চলে আসেন। তাঁদের নিজ নিজ পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী এবং রাজ্যের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে তাঁরা সকলেই উপযুক্ত পরগণা ও গ্রামের স্বত্ব লাভ করেন। সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার জন্যে বিতাড়িত হয়ে সুলতান ইব্রাহিম লুদির কন্যাও এদেশে আগমন করেন এবং রাজা নসরৎ শাহের সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন।'

শেরশাহের বংশের শাসনকর্তাদের আমলেও এ রীতি প্রচলিত ছিলো যে দিল্লী থেকে যে কোনো আমিরই পলায়ন করতেন তিনিই আশ্রয়লাভের জন্যে বাংলায় চলে আসতেন। সাধারণভাবে আদলি শাহ্ নামে অভিহিত শাহ্ মোহাম্মদের শাসনকালের ঘটনাপঞ্জীতে এধরনের বিবরণ আছে—

> সলিম শাহের অন্যতম প্রধান আমির তাজ খান করানি একই দিনে গোয়ালিয়র দুর্গের দেওয়ানখানা থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন; তখন শাহ্ মোহাম্মদ কিরমিলি ফটকের নিকট তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। (জবাবে) তাজ খান তাঁকে বললেন,

'অবস্থা ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে এবং এ সমস্ত ব্যাপার থেকে আমি নিজেকে প্রত্যাহার করেছি। আপনিও আসুন এবং আমার সংগে একতাবদ্ধ হোন।' শাহ মোহাম্মদ তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আদলি শাহের আনুগত্য স্বীকারের জন্যে চলে গেলেন এবং সেখানে যেমনি কর্ম তেমনি ফল ভোগ করলেন। দুর্গ পরিত্যাগ করে তাজ খান করানি যখন বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন আদলি শাহ ইব্রাহিম খান সুরকে, যিনি প্রচুর জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সহিত বাস করতেন, বন্দী করার কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আদলির ভগ্নী; তিনি এ ঘটনার কথা অবগত হয়ে তাঁর স্বামীকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তখন ইব্রাহিম খান ছতর থেকে পলায়ন করে তাঁর পিতার সমক্ষে হাজির হওয়ার জন্যে যাত্রা করেন। তাঁর পিতা গাজি খান হণ্ডুনের শাসক ছিলেন। আদলি ঈসা খান নিয়াজি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং কল্পির নিকট তাঁর নাগাল পান। সেখানে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে ঈসা খান পরাজিত হয়ে আর অধিক পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হন। ইব্রাহিম খান একদল সৈন্য সংগ্রহ করে সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর নিজের নামে খোৎবা পাঠের প্রচলন করে তিনি সেখান থেকে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন এবং সন্নিহিত রাজ্যগুলির অধিকার লাভ করে পূর্ণভাবে তাঁর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর তিনি ইব্রাহিম শাহ্ নাম ধারণ করেন এবং নিজেকে রাজমর্যাদার পর্যায়ে উন্নীত করেন।

আদলির উযির মুদি হিমু রাজা ইব্রাহিমকে বিতাড়ন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কল্পির নিকট তাঁর ক্ষমতা

চূর্ণ করে দেন। রাজা ইব্রাহিম তাঁর পিতার নিকট যাওয়ার ভান করলেন। মুদি হিমু সেদিকে অগ্রসর হয়ে তিনমাসকাল অবধি তাঁর পথ অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু বাংলার সুবাদার মোহাম্মদ খান সুর বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে ছতর, জৌনপুর ও কল্পি অধিকারের জন্যে অগ্রসর হওয়ায় আদলি মুদি হিমুকে ডেকে পাঠান; হিমু তখন এ তলব পালন করার জন্যে অবরোধ ত্যাগ করেন। রাজা ইব্রাহিম তখন পাটনা রাজ্যের দিকে গমন করেন এবং সেখানকার শাসনকর্তা রাজা রামচন্দরের সংগে যুদ্ধ করে তাঁর হাতে বন্দী হন। রাজা রামচন্দর সে সময়ের নীতি অনুসারে অতিশয় মর্যাদার সহিত তাঁর নিজের সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং ইব্রাহিম খানের প্রতি চাকরের মতো ব্যবহার করেন। কিছুকাল পরে রায়সিনের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী বায়ানার আফগানদের ও মালোয়ার সুবাদার আয়ায বাহাদুরের মধ্যে কলহ দেখা দিলো। (বিবদমান) আফগান দলটি রাজা রামচন্দরের নিকট একদল প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইব্রাহিম শাহ্‌কে তাদের মধ্যে আনার ব্যবস্থা করে এবং তাঁকে তাদের নেতা মনোনীত করে। তারা গড়িয়ার রানী দুর্গাবতীর সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তারপর আয়ায বাহাদুরের সংগে যুদ্ধ করার জন্যে ইচ্ছা করে। রানী তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর রাজ্য ছেড়ে অগ্রসর হন। আয়ায বাহাদুর রানীর নিকট তাঁর দূত প্রেরণ করেন এবং তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য থেকে নিবৃত্ত করেন। ইব্রাহিম শাহ্‌ যখন দেখতে পেলেন যে রানী দুর্গাবতী তাঁর স্বীয় আচরণে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন তিনি সেখানে অধিককাল

অবস্থান করাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন না; কাজেই তিনি বাংলার সীমান্তস্থিত রাজ্য উড়িষ্যায় চলে যান এবং সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

আফগান রাজবংশের সর্বশেষ প্রদীপ এবং যাঁর রাজত্বের শেষভাগে ভারত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব শেরশাহের বংশ থেকে তৈমুরের বংশে চলে যায় সেই সিকান্দর শাহ্ সুর জালাল উদ্দীন সম্রাট আকবরের হাতে পরাজিত হয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করে বাংলায় পলায়ন করেন। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা'র নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে এ ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়—

> এমন ঘটেছিলো যে সে সময়ে হুমায়ুন বাদশাহ্ পাঞ্জাবের দিকে তাঁর গতি পরিবর্তিত করেন এবং তাতার খান রোহ্তাস থেকে পাঞ্জাবের পথে দিল্লীতে পলায়ন করেন। হুমায়ুনের মোগল অনুচরগণ লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আফগানদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং সিরহিন্দ পর্যন্ত তাদের বিজয় অভিযান বিস্তৃত করে সে সমস্ত এলাকা তাদের অধিকারভুক্ত করে। সিকান্দর শাহ্ চাঘতাই সেনাদলকে বিতাড়নের জন্যে তাতার খান ও হায়বত খানের সেনানায়কত্বের অধীনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী (কিংবা অপর বিবরণ অনুযায়ী এক লক্ষ আফগান ও রাজপুত অশ্বারোহী) প্রেরণ করেন।
>
> আফগানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং তারা তাদের অশ্বের গতি পরিবর্তিত করে দিল্লী পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের লাগাম টানেনি। সিকান্দর শাহ্ যদিও তাঁর আমিরদের বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন, তথাপি তিনি প্রয়োজনের তাগিদে ষাট হাজারের একটি

সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং ৯৬২ হিজরিতে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন। তিনি তুর্কী বৈরাম খানের সম্মুখীন হন। বৈরাম খান তখন সিরহিন্দের নিকটে যুবরাজ জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ আকবরের অনুচরবর্গের মধ্যে ছিলেন। সিকান্দর শাহ্ পরাজয় বরণ করে ছত্রভংগ হয়ে সোয়ালক পর্বতের দিকে হটে যান। এভাবে দ্বিতীয় বারের জন্যে প্রধান শহর দিল্লী ও আগ্রা বাদশাহ হুমায়ুনের অনাত্যদের হাতে চলে যায় এবং এই সুবৃহৎ ভূভাগ সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর বস্তুর সমাবেশে এতই সজ্জিত হয়েছিলো যে এদিক দিয়ে ইহা স্বর্গীয় উদ্যানের সমতুল্য ছিলো। তুর্কী বৈরাম খানের হিতকর প্রচেষ্টার জন্যে সিকান্দর শাহ্ সুর পর্বতের ওপর থেকে অবতরণ করতে সমর্থ হন এবং সেখান থেকে গৌড় ও বংগ দেশের দিকে পলায়ন করেন। তিনি সে সমস্ত রাজ্যের অধিকার লাভ করেন এবং কিছুকাল পরেই সেখানে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর স্থানে তাজ খান করানি বাংলার শাসক হন।

একই ইতিহাসে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের বিবরণে নিম্নোক্ত অংশটুকু প্রদত্ত হয়েছে—

মানকোটের দুর্গ অবরোধের মেয়াদ ছয় মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিকান্দর শাহ্ একজন বিশ্বাসযোগ্য উচ্চ পদস্থ লোককে তাঁর নিকট প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যাতে সেই প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর শর্তাদি উপস্থাপিত করার পর তিনি যেভাবে আদিষ্ট হবেন সেভাবেই কাজ করতে পারেন। সেই অনুসারে খান-ই-আযম শামস উদ্দীন মোহাম্মদ খান আতকা দুর্গে গেলেন। সিকান্দর তাঁকে

বললেন 'আমার অপরাধের সংখ্যাধিক্যের দরুন আমি রাজার সম্মুখে যেতে সাহস পাচ্ছি না ; কিন্তু আমি আমার পুত্র শেখ আবদুর রহমানকে দরবারে পাঠাতে চাই এবং আমি নিজে বংগ দেশে চলে যেতে চাই ও সেখানে আনুগত্যের সহিত বাস করতে চাই।' খান-ই-আযম শামসউদ্দীন ফিরে এসে প্রস্তাব-গুলি সম্রাটের নিকট পেশ করেন ; সম্রাট প্রস্তাবগুলিতে সম্মত হন। শেখ আবদুর রহমান ৯৬৪ হিজরির রমযান মাসে সম্রাটের সমক্ষে এসে হাজির হন এবং উপহারস্বরূপ কয়েকটি হাতী রাজাকে দান করেন। সিকান্দর শাহ্ বঙ্গদেশে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন।

মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তি ও অন্যান্য নেতার শক্তি দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর তাঁদেরকে সংগ্রহ করতেন এবং বংগদেশে পাঠিয়ে দিতেন। আবদুল কাদের বদায়ূনি তাঁর 'মনতা-খাবাত তাওয়ারিখ' গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠায় সম্রাট আকবরের বিবরণে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন—

> সম্রাট আকবরের শাসনামলে মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করতেন, সে জ্ঞানই তাঁদের দুর্ভাগ্য ও পতনের কারণ হয়ে-ছিলো। সম্রাট সমস্ত শিক্ষিত ও ধার্মিক লোক এবং জন-সাধারণের আধ্যাত্মিক নেতাদেরকে তাঁর দরবারে আনার জন্যে আদেশ দিতেন ; তিনি নিজে তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় ও পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং প্রচলিত সম্মানের সহিত প্রকাশ্যভাবে বা নির্জনে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করে তিনি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করতেন তাদের জন্য সেরূপ জমি বন্দোবস্ত করে দিতেন। যাদেরকে তিনি

মজলিস (সভা) সামা কিংবা কুলালিকে (বৃত্তের গঠনে একটি সভা, যখন শ্রোতাদেরকে উত্তেজিত করার জন্যে ধর্মীয় সংগীত গাওয়া হয়) শিষ্য সমাবেশের কাজে অথবা তাদের সংগে সম্পর্ক রাখায় অভ্যস্ত বলে জানতেন, তাদেরকে পেশাগত ব্যবসায়ী হওয়ার জন্যে চাপ দিতেন এবং তাদেরকে দুর্গে আটক করে রাখতেন কিংবা বংগদেশ ও বিহারে নির্বাসন দিতেন। এ ধরনের ব্যাপার তাঁর শাসনকালে সর্বদাই ঘটতো। সমস্ত বয়স্ক ও দুর্বল অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক ও শেখেরা (খোদা-ভক্ত ও ধার্মিক লোকেরা) অন্যান্য লোকের চাইতে অনেক বেশী করুণার পাত্র ছিলেন ; কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার বিবরণ এতো বেশী বিস্তৃত যে এখানে সেগুলি উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

এ ধরনের রাজাজ্ঞানুযায়ী সুফি ও সাহেব সামাকে (অর্থাৎ যে সমস্ত ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি ও সিদ্ধ-পুরুষ 'মজলিস-ই-সামা'র সংগে জড়িত এবং একনিষ্ঠ খোদাভক্ত ছিলেন) হিন্দু কর্মচারীদের কর্তৃত্ব ও আদেশাধীনে আনা হতো এবং তাঁদেরকে এমন শোচনীয় অবস্থায় ফেলা হতো যে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মর্যাদা ভুলে যেতেন। তাঁরা তাঁদের বাড়ী থেকে নির্বাসিত হয়ে ইঁদুরের গর্তে ঢুকতেন, অর্থাৎ কোনো গুপ্ত স্থানে আত্ম-গোপন করতেন এবং তাঁদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতো।

সোলেমান শাহের পুত্র দাউদ শাহ্ ছিলেন বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজা। দাউদ শাহের অসংখ্য দাসদাসী ও অনুচর ছিলো এবং তাঁর শক্তি ও ধনসম্পদ এতো বেশী ছিলো যে তিনি ৪০ হাজার সুদক্ষ

অশ্বারোহী সৈনিক, ৩ শত হাতী এবং গোলন্দাজ বাহিনী, বন্দুকধারী সৈনিক, তীরন্দাজ ও ধনুর্ধর সহ ১৪০ হাজার পদাতিক সৈন্যের অধিকারী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর ২০ হাজার যুদ্ধাস্ত্র ছিলো, যেগুলির অধিকাংশই ছিলো কামান, বেশ কিছু সংখ্যক রণতরী এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম (—রিয়াজ-উস-সালাতিন থেকে)। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এবং ৯৮৪ হিজরিতে তিনি বংগদেশে খান জাহান খান কর্তৃক বন্দী ও নিহত হন। এ ঘটনার পর বংগদেশ মোগল কিংবা তৈমুরের বংশের কর্তৃত্বাধীনে আসে। তখন থেকে বংগদেশ শাসনের জন্যে দিল্লীর দরবার কর্তৃক তুরানী কিংবা আরব বংশোদ্ভূত নাযিম বা সুবাদার নিযুক্ত হতেন। এই মুসলমান নাযিম এবং শাসকদের শাসনকালে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলায় আগমন করতো এবং বসতি স্থাপন করতো। বিশেষতঃ আমিরুল ওমরাহ্ নবাব শায়েস্তা খানের শাসনকালে এ ঘটনা বেশী ঘটতো। সদ্বংশজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের হিত সাধনের জন্যে তিনি যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তারই ফলে অসংখ্য সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমান এদেশে বসতি স্থাপন করে। এভাবে বাংলাদেশ জনাকীর্ণ হয়ে উঠে এবং তিনি তাঁদেরকে নিষ্কর গ্রাম ও জায়গিররূপে বহু ভূসম্পত্তি দান করেন।

শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খানের শাসনকালে পারস্যের বাদশাহ্ নাদিরশাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং দিল্লী ও অন্যান্য সহর লুণ্ঠন করেন। সে সময়ে দিল্লী এবং এর চারপাশের এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খানের আশ্রয়লাভের জন্য বাংলাদেশে পলায়ন করে। উক্ত শাসক এই শরণার্থীদের প্রতি উদার ব্যবহার দেখান এবং তাদেরকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তাঁর এহেন আচরণ বহিরাগতদের সমাগমকে নতুন

তৎপরতা দান করে। 'তারিখ-ই-মনসুরি' থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত অংশটি একথার সাক্ষ্য দেয়—

> তাঁর রাজ্যে কোনো আগন্তুকের অনুপ্রবেশের সংগে সংগে তিনি তার আগমন এবং নবাগত লোকটি সদ্বংশজাত কিনা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কিনা এ উভয়বিধ বিষয় সম্পর্কে সংবাদ নিতেন। মুর্শিদাবাদে এধরনের লোকের আগমনের পর দরবারস্থ কোনো কর্মচারীর সহিত সেই আগন্তুকের সম্পর্ক আছে কিনা তা দেখার জন্যে তিনি তিন দিন অপেক্ষা করতেন। যদি সেরূপ সম্পর্ক থাকতো, এবং কেউ তার সম্পর্কে কিছু বলতেন, তাহলে তিনি তাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তার অভিপ্রায় সিদ্ধ করতেন। আর যদি দরবারের কোনো কর্মচারীর সংগে এই নবাগতের সম্পর্ক না থাকতো কিংবা কেউ তার সম্পর্কে কিছু না বলতো তাহলে চতুর্থ দিনে তিনি নিজেই নবাগতের নামোল্লেখ করে বলতেন যে তার সহিত কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ঘনিষ্ঠতা বা প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, নতুবা নিশ্চয়ই কেউ তার সম্পর্কে কিছু বলতেন। তারপরেও যদি কেউ তার সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে খবর দিতো, তাহলে খুবই উত্তম হতো ; নতুবা তিনি নিজেই তার সম্পর্কে খবর নেয়ার জন্য লোক পাঠাতেন এবং তার নিকট এ খবরও পাঠাতেন যে তাকে যখন তাঁর রাজ্যে আসতে হয়েছে তখন সে যেন তাঁর সংগে দেখা করে। তিনি তারপর গোপনে তার আচার-ব্যবহার ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন। তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সংগে পরিচিত হওয়ার পর তিনি তার অভিপ্রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। যদি তিনি মনে করতেন যে সে তাঁর অনুগত হয়ে

থাকতে ইচ্ছুক এবং চাকরির প্রত্যাশী, তাহলে তিনি তাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত ও সদয়ভাবে তাঁর চাকরিতে নিয়োজিত করতেন এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজনীয় খরচের জন্য পরিমিত অর্থ সরবরাহ করতেন ; সেই সংগে তিনি তাকে এই ইংগিত দিতেন যে (একজনের প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচাদি মেটাতে) এই পরিমিত সংখ্যক অর্থই যথেষ্ট ; তা ছাড়া সর্বশক্তিমান আল্লার আরো দেয়ার ক্ষমতা আছে। ইহা তাঁর স্বাভাবিক অভ্যেস ছিলো যে যখনই তিনি কারুর নিকট কোনো উপহার পাঠাতেন, যদি বাহক গ্রহীতার নিকট থেকে কোনো পুরস্কার কিংবা বখশিশ গ্রহণ করতো তাহলে তিনি সেজন্যে বাহক ও গ্রহীতা উভয়কেই ভর্ৎসনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে তাঁর ভৃত্যদের সহিত এমন উদারতার সংগে ব্যবহার করতেন যে তাদের কারুরই বখশিশ নেয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতো না। যে সমস্ত সভাসদ তাঁর নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা এই মহানুভব শাসকের লংগরখানা থেকে বারকোশ ভর্তি মুখরোচক ও সুস্বাদু খাদ্য পেতেন। নিয়ম ছিলো এই যে কেউ কেউ এ খাদ্য রোজই পেতেন, কেউ পেতেন একদিন পরপর এবং অন্যেরা পেতেন সপ্তাহে দু'বার। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর এই অতিথিপরায়ণতার নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি নিজে একটি নোট-বই রাখতেন, যার পাতাগুলি আইভরির তৈরী ; এ নোট-বইয়ের পাতায় তাঁর সংগে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁর পরিচারক ও সভাসদদের নামের একটি স্মারকলিপি থাকতো। প্রতি রাত্রে বিছানায় যাওয়ার আগে এই পাতাগুলির ওপর তিনি দৃষ্টি বুলাতেন এবং সেখান থেকে কয়েকটি নাম বাছাই করে প্রতিটি নামের পার্শ্বে তাঁর

নিজের হাতে টাকার এমন একটি অংক লিখতেন যা একজনের সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী ছিলো এবং সেই অংকটা প্রায় ক্ষেত্রেই মোটা হতো; তারপর সরকারী ভূমির আয় থেকে এ অংকের প্রতিটি দফা পরিশোধের জন্যে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীদেরকে আদেশ দিয়ে এ দানের কথা প্রাপকদেরকে কিংবা তাদের প্রতিনিধিদেরকে জানাতেন। যদি সে (দান গ্রহণকারী) এ ঘটনার কথা প্রকাশ না করতো, তাহলে তার সম্মান ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু যে এর বিপরীত আচরণ করতো, সে এই অবিশ্বাসী আচরণের জন্যে তাঁর বিশ্বাস হারাতো এবং তার প্রতি কোনো রকমের রুক্ষ ব্যবহার না দেখিয়ে তিনি এ ধরনের অপরাধীদের নাম নোট-বই থেকে মুছে ফেলতেন। তিনি তাঁর সারাজীবন ব্যাপী এ অভ্যেস বজায় রেখেছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে বর্ণিত স্থলপথে আগমনকারী বিদেশী ঔপনিবেশিকদের ছাড়াও অসংখ্য লোক জলপথে এদেশে আগমন করে।

তখন হুগলী ছিলো বংগদেশের বন্দর এবং বিদেশের জাহাজগুলি এখানেই নংগর করতো। আরব ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ থেকে যারা এদেশে আগমন করতো তারা হুগলীতেই অবতরণ করতো এবং সেসব দেশে যারা ফিরে যেতো তারাও এখান থেকেই জাহাজে আরোহণ করতো। বাংলাদেশের এবং দিল্লী পর্যন্ত হিন্দুস্তানের উত্তরাংশের অধিবাসীদের মধ্যে যারা মক্কায় ও অন্যান্য পবিত্র স্থানে তীর্থ যাত্রা করতো, তারা হুগলী থেকেই জাহাজে আরোহণ করতো। অধিকন্তু পারস্য, খোরাসান, ইরাক, আরব

ও মিসর থেকে যেসমস্ত লোক জলপথে হিন্দুস্তানে কিংবা বাংলায় আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করতো তারা এখানেই জাহাজ থেকে অবতরণ করতো। এভাবে কালক্রমে বহুসংখ্যক বিদেশী মুসলমান দ্বারা বংগদেশ জনাকীর্ণ হয়েছিলো।

উদাহরণের সাহায্যে এসমস্ত প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্যে আমি এমন ক'টি পরিবারের অবস্থার কথা এখানে উল্লেখ করবো যাঁরা এই জলপথে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন এবং এখান থেকে অগ্রসর হয়ে দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে গিয়ে উচ্চপদে উন্নীত ও খ্যাত হতে পেরেছিলেন।

(১) **অযোধ্যার রাজপরিবার—** এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব বুরহান-উল-মুল্‌ক খান বাহাদুর নামে অভিহিত মোহাম্মদ আমিন নিশাপুরের অন্যতম সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার সংগে নিশাপুর থেকে বংগদেশে আগমন করেন এবং কিছুদিনের জন্যে এখানে অবস্থান করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, যাঁর সমাধিস্তম্ভ এখন পর্যন্ত আযিমাবাদে (পাটনা) বিদ্যমান আছে, তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তথায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 'ইমাদ উস-সাদৎ' এর লেখক বর্ণনা করেছেন যে মির্যা নাসিরের দুই পুত্র ছিলো; তাঁর স্ত্রী ছিলেন নিশাপুরের সৈয়দ শামসউদ্দীনের কন্যা। মির্যা সাহেবের এক পুত্রের নাম ছিলো মীর মোহাম্মদ বকর এবং অপরটির নাম মীর মোহাম্মদ আমিন। ১১১৮ হিজরিতে মির্যা নাসির তাঁর পুত্র মীর মোহাম্মদ বকরকে সংগে নিয়ে জাহাজে করে বংগদেশে আগমন করেন এবং আযিমাবাদে তাঁর বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি বাংলার নাযিম শুজাউদ্দৌলা শুজাউদ্দীন মোহাম্মদ খানের সরকার থেকে ভরণপোষণের ভাতা

পেতে থাকেন। এসময়ে মীর মোহাম্মদ বকর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। পরে এই বালক তাঁর পিতৃব্য বুরহান-উল মুল্‌কের ক্ষমতালাভের সময় বশির জং উপাধি লাভ করেন এবং দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক কাশ্মীরের সুবাদারের পদে নিযুক্ত হন। নিশাপুর রাজ্যে অবস্থানরত মীর মোহাম্মদ আমিন ১১২০ হিজরিতে তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ পিতা ও ভাইকে দেখার উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন এবং তাঁদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। কিছুদিন পরে মির্যা নাসির আযিমাবাদে পরলোকগমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতা বংগদেশ ত্যাগ করে শাজাহানাবাদের দিকে যাত্রা করেন; সেখানে তাঁরা ধীরে ধীরে পদমর্যাদায় প্রাধান্য লাভ করতে থাকেন। মীর মোহাম্মদ আমিন মোহাম্মদ শাহ্‌ বাদশার নিকট থেকে বুরহান-উল-মুলক সাদৎ খান খেতাব সহ সাত হাজার সেনার অধিনায়কত্ব লাভ করেন এবং অযোধ্যার সুবাদারের পদে নিযুক্ত হন।

(২) **রাজ-চিকিৎসক হাকিম উলভি খানের পরিবার**—নওয়াব উলভি খানের বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃব্য হাকিম মীর মোহাম্মদ হাঁদি সমুদ্রপথে বংগদেশে আগমন করেন। তিনি হুগলীর ফৌজদারের (সেনানায়কের) প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে শুজাউদ্দীন মোহাম্মদ খানের সমক্ষে পরিচিত হন এবং তাঁর দরবারে একটি চাকরি লাভ করেন। উলভি খানও তাঁর পিতৃব্যের সংগে আসেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন এবং উলভি খানের শিক্ষাধীন ছিলেন। কালক্রমে হাকিম মীর মোহাম্মদ হাদি তাঁর শিক্ষার জন্যে প্রসিদ্ধি এবং পদার্থ বিদ্যায় তাঁর দক্ষতার জন্য সম্মান লাভ করেন। মোহাম্মদ শাহ্‌ বাদশার একজন ভালো চিকিৎসকের প্রয়োজন

হওয়ায় এবং বাংলার নাযিমের নিকট একজন দক্ষ চিকিৎসক আছেন একথা জানতে পারায় তিনি সেই চিকিৎসককে দিল্লীতে পাঠানোর জন্যে নাযিমের নিকট পত্র লেখেন। কিন্তু মীর মোহাম্মদ হাদি দিল্লী যাওয়ার মতো উপযোগী ছিলেন না কিংবা নিজের স্বাস্থ্যের মংগলের কথা চিন্তা করে নাযিমও তাঁকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না ; কাজেই তিনি সম্রাটের নিকট এই মর্মে জবাব পাঠালেন যে বার্ধক্য ও দুর্বলতার জন্য হাকিম মীর মোহাম্মদ হাদি দিল্লী পর্যন্ত ভ্রমণ করার মতো দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগ। কিন্তু তিনি হাকিম সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠাচ্ছেন, যিনি তাঁর পিতৃব্যের অধীনে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং এ বিদ্যায় তাঁর সমান পারদর্শী। তথাপি প্রয়োজন দেখা দিলে মীর মোহাম্মদ হাদি নিজেই যাবেন। উলভি খান নাযিমের দরখাস্ত সংগে করে দিল্লীর সম্রাটের নিকট গেলেন এবং সেখানে তিনি যে উচ্চপদে উন্নীত হয়েছিলেন আর যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা ছিলো সূর্যের চাইতেও স্পষ্টতর (অর্থাৎ এতই সুপরিচিত যার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন)। এই হাকিম পরিবারের অন্যান্য লোক মুর্শিদাবাদে থেকে গেলেন এবং অদ্যাবধি তাঁরা সেখানেই বাস করছেন। বংগদেশের নায়েব নাযিম নওয়াব মুযাফ্ফর জং এ পরিবারেরই লোক ছিলেন, যার বিবরণ বিভিন্ন ইতিহাসে পাওয়া যাবে।

(৩) বাংলায় আর্মানি ঔপনিবেশিকগণ—বহুকাল আগে এই আর্মানিদের পূর্বপুরুষেরা ইরানের কোনো এক রাজার নির্যাতন ও উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে সে দেশ থেকে পলায়ন করে সমুদ্রপথে বাংলায় আগমন করে ; এখানে তারা বসতি স্থাপন করে এবং তাদের বংশধরগণ বরাবর এদেশেই বসবাস করতে থাকে।

ঠিক একই ভাবে বিভিন্ন বংশ, গোত্র ও শাখার লোকেরা বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চল থেকে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। আগের পৃষ্ঠাগুলিতে আমি দেখিয়েছি যে, রাজধানী দিল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে মুসলমান বহিরাগতগণ বাংলার জনসংখ্যাকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে এবং এদেশকে তাদের স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছে। কাজেই যেসব দেশ থেকে মুসলমানেরা প্রথমতঃ দিল্লীতে আসে, এখানে সেসব দেশের রাজনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র অঙ্কন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

রুমসহ খিলাফতের আবাসস্থল খোরাসান ও আফগানিস্তান থেকে বাগদাদ পর্যন্ত সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এক সময়ে মুসলমানদের শাসনাধীন ছিলো ; এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ চেঙ্গিস খান ও তাঁর বংশধরদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়। এই আক্রমণকারীদের প্রচণ্ডতা ও অত্যাচারে উচ্চ ও নীচ সকলের জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেসমস্ত দেশ তাদের পদানত হয়, সে সমস্ত দেশ থেকে তারা মুসলমানদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছিলো এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকল মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলো। ফলে এই মুসলমানগণ নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য দেশে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। তখন ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী মুসলমান সরকার ছিলো বলে অধিকাংশ শরণার্থী এদেশে পলায়ন করে। 'তবাকাৎ-ই-নাসিরি'[১] নামক গ্রন্থে এ ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত

---

১ Major H. G. Raverty কৃত 'তবাকাৎ-ই-নাসিরি'র অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৮৬৯—৮৮৮ দ্রষ্টব্য।

হয়েছে : —

সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা ও অদৃষ্টের লিখনের বলে ইরান ও তুরানের রাজাদের মৃত্যুর পর সার্বভৌম ক্ষমতার গতি অভিশপ্ত চেঙ্গিস খান ও তাঁর বংশধরদের দিকে গেলো এবং তুরান ও প্রাচ্যের সমগ্র ভূভাগ মোগলদের শাসনাধীনে পতিত হলো। মুসলমান ধর্মের নেতাগণ সে সমস্ত ভূভাগ থেকে প্রস্থান করলেন। সে সমস্ত ভূভাগে প্যাগান ধর্ম প্রসার লাভ করেছিলো। সর্বশক্তিমান আল্লার অনুগ্রহ ও সৌভাগ্যবশতঃ, শামসি বংশের অভিভাবকত্বাধীনে এবং আলতিমিসি রাজবংশের আশ্রয়চ্ছায়ার হিন্দুস্তান সাম্রাজ্য মুসলমানদের জন্যে জ্যোতিঃ-কেন্দ্র ও ধার্মিকদের জন্যে কক্ষকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিলো। চীন, মাওয়ারন্নাহার, তুখারিস্তান, যাওল, ঘোর, কাবুল, গযনি, ইরাক, তাবারিস্তান, ইরান, দ্বার-ই-বকর, খোরাসান ও মনসিলের প্রান্ত থেকে সুদূর রুম ও শ্যামের সীমান্ত পর্যন্ত ভূভাগ বিধর্মী মোগলদের হাতে পতিত হয় ; এ সমস্ত দেশে মুসলমান বাদশাহ ও সুলতানদের চিহ্নমাত্রও ছিলো না। তাঁদের ওপর আল্লার করুণা বর্ষিত হোক এবং তিনি নাসিরিয়া রাজবংশকে রক্ষা করুন।

একই গ্রন্থে আরো লিখিত আছে যে ৬১৪ হিজরির ঘটনাবলীর পর চেঙ্গিস খান মোগলের আক্রমণ ও সহসা অনুপ্রবেশের দরুন খোরাসানে জালালউদ্দীন খোয়ারেজম শাহ্ বিধর্মী সেনাবাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়ে ৬১৬ হিজরিতে হিন্দুস্তানের দিকে আগমন করেন।

একই গ্রন্থকার নিম্নলিখিত ঘটনার কথাও বর্ণনা করেছেন—

সুলতান তাঁর রাজত্বের প্রারম্ভকাল ও সার্বভৌমত্বের

উষালগ্ন থেকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইনবেত্তা, শ্রদ্ধাস্পদ সৈয়দ, মালিক, আমির, সর্দার এবং (অন্যান্য) মহৎ লোকদেরকে সমবেত করার জন্যে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করতেন। তিনি রাজধানী দিল্লী নগরীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোক সংগ্রহ করেছিলেন। এই দিল্লী নগরী ছিলো হিন্দুস্তানের রাজধানী ও ইসলামী বৃত্তের কেন্দ্রস্থল; ইহা 'ম্যাগুেট'-এর আশ্রয়স্থল, মুহম্মদ প্রবর্তিত মুসলমান ধর্মের আবাসস্থল, আহমদী ধর্মমতের মূল কেন্দ্রস্থল এবং বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের পবিত্র স্থানরূপে পরিচিত ছিলো। হে আল্লাহ্, দুর্দশা ও উৎপীড়ন থেকে একে রক্ষা করো। সেই ধার্মিক রাজার অপরিমিত দান ও সীমাহীন বদান্যতার জন্যে এই শহর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত, ধার্মিক ও গুণী লোকদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও বিশ্রামাগাররূপে পরিগণিত হয়েছিলো। মহত্তম আল্লার অনুগ্রহের ফলে আযম রাজ্যের প্রদেশ ও জেলাগুলির যে সমস্ত অধিবাসী কঠোর পরিশ্রম, অপরিমিত দুঃখ-দুর্দশা এবং বিধর্মী মোগলদের আক্রমণের ফলে সংঘটিত দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলো তারা রাজধানীটিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থলে পরিণত করে—বিশেষ করে উপরোক্ত শাসকের আমলে দিল্লী নগরী বিদেশী মজলুমদের জন্যে আশ্রয়, বিশ্রাম ও নিরাপত্তা লাভের নির্ভরস্থল ছিলো। অদ্যাবধি সেখানে ঐ সমস্ত নিয়ম পালিত হয়ে থাকে; এখনো সেগুলি অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে এবং সর্বদা এ অবস্থা বজায় থাকতে পারে। একই বিষয় সম্পর্কে 'ফিরিশ্‌তা'য় নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

সে সময়ে রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য (আসবাবপত্র ও অলঙ্কারাদি) দিয়ে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ ও সজ্জিত

করা হয়েছিলো। চেঙ্গিস খান কর্তৃক সংঘটিত বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার কারণে, ইরাক, খোরাসান ও মাওয়ারন্নাহারের বহু উচ্চমর্যাদাবিশিষ্ট লোক, সৈয়দ, ধর্মতত্ত্ববিদ, বিখ্যাত সর্দার ও পঁচিশজন যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাঁর আশ্রয়াধীনে বাস করতে থাকেন। তাছাড়া বহু রায় ও রাজা তাঁর সিংহাসন থেকে মর্যাদাপূর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকতেন। বিজাপুরের শেখ আইনুদ্দীন রচিত 'মালহিকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে কেবলমাত্র এই মর্যাদা ও সৌভাগ্যই সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের (সন্তুষ্টির) জন্যে যথেষ্ট যে পূর্ববর্তী রাজাদের শাসনকালে বিদেশের যে সমস্ত প্রাক্তন শাসক ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের দ্বারাও তাঁর শাসনকালে তুর্কিস্তান, মাওয়ারন্নাহার, খোরাসান, ইরাক, আজারবাইজান, খোয়ারেজম, রুম ও শ্যাম দেশ থেকে পনেরোজন যুবরাজ চেঙ্গিস খানের আক্রমণের ফলে তাঁদের ক্ষমতার আসন থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে দিল্লীতে আগমন করেন এবং সম্মানিত ও উচ্চপদে নিযুক্ত হন। তাঁরা তাঁর সিংহাসনের সম্মুখে অতিশয় আনন্দ ও আন্তরিকতার সহিত অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকতেন ; কেবল দুজন যুবরাজ আব্বাসী খলিফাদের বংশধর ছিলেন বলে সিংহাসনের পাদমূলে আসন গ্রহণ করতেন। তাঁর রাজত্বকালে যখনই কোনো যুবরাজ কিংবা সে যুগের সুপ্রসিদ্ধ লোক ভারতবর্ষে আগমন করতেন তখনই তিনি অভ্যেসমতো আনন্দ প্রকাশ করতেন ও আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিতেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে (দিল্লী) শহরের এক একটি বাসগৃহ পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দিতেন। তাঁদের এই অবস্থানের ফলে পনেরটি (অতিরিক্ত)

মহল্লা অস্তিত্ব লাভ করে। যথা— (১) আব্বাসিয় মহল্লা, (২) সাঞ্জারি মহল্লা, (৩) খোয়ারেজমি মহল্লা, (৪) দেলেমি মহল্লা, (৫) উলভি মহল্লা, (৬) আতাবেকি মহল্লা, (৭) ঘোরি মহল্লা, (৮) চেঙ্গিজি মহল্লা, (৯) রুমি মহল্লা, (১০) সঙ্করি মহল্লা, (১১) ইয়ামনি মহল্লা, (১২) মোসলি মহল্লা, (১৩) সমরখন্দি মহল্লা, (১৪) খাশগরি মহল্লা এবং (১৫) খতাই মহল্লা। অসি ও মসি বিদ্যায় পারদর্শী সে সমস্ত বিখ্যাত পরিবারের বংশধরগণ ও সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংগীত ও শিল্প-কলার নিপুণ শিল্পিগণ, যাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এ পৃথিবীর কোথাও ছিলো না, তাঁর দরবারে সমবেত হতেন। তাঁদের জন্যে তাঁর দরবার (সুলতান) মাহমুদ কিংবা (সুলতান) সাঞ্জারের দরবারের চাইতে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলো বলে অভিহিত হতো। কথিত আছে যে, সমস্ত জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জন এবং ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খানে শহীদ নামে সাধারণভাবে অভিহিত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের গৃহে সমবেত হতেন; অপরপক্ষে সংগীতবিদ, আনন্দদানকারী ও গল্পকথক, বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ ভাঁড় ও বিদূষক বোঘ্‌রা খান নামক তাঁর অপর পুত্রের সভায় সমবেত হতেন এবং তাঁরা একটি রাজকীয় প্রমোদ দল গঠন করেন।

একই ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে—

সুলতান মোহাম্মদ তোগলকের রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মহৎ ও প্রসিদ্ধ লোক এবং যাদের সৌভাগ্যসূর্য অস্ত গিয়েছিলো সেই ভাগ্যহীন লোকেরা তাঁর কাছ থেকে সদয় ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার লাভের আশায় ইরান, খোরাসান, মাওয়ারন্নাহার, তুর্কিস্তান ও আরবদেশ থেকে হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে

তাঁরা যতটুকু প্রত্যাশা করেছিলেন তার চাইতেও অনেক বেশী অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি আমি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে গ্রহণ করেছি তা থেকে একথা সুস্পষ্ট হবে যে আরব, ইরান, তুর্কিস্তান ও খোরাসানের বিশৃঙ্খলার জন্যে সেসব রাজ্যের উচ্চ ও নীচস্তরের জনসাধারণ প্রধানতঃ ভারতবর্ষে আগমন করে; বিশেষ করে সেসব দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ সেই দুর্যোগপূর্ণ ও দুর্ভাগ্যজনক সময়ে তাঁদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যে এবং তাঁদের শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। এই শরণার্থীদের অধিকাংশই দিল্লীতে সমবেত হন এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সম্রাটের অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাও দেখানো হয়েছে যে ঘোরি, খিলজি, তোগলক সৈয়দ, লুদি ও মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে দিল্লী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ থেকে লোকেরা বাংলাদেশে অবিরাম গতিতে আগমন করতো। ইহা ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত রায় যে সুলতান কায়কোবাদের রাজত্বকালে সরকারের বিপ্লবের জন্যে এবং সুলতান মোহাম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে নৃশংসতা ও দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তির ভয়ে দিল্লীতে যতো লোক ছিলো তাদের প্রায় সকলেই বাংলায় আগমন করে। বাংলার রাজা ও শাসকগণ সর্বদাই এই বহিরাগতদের সংগে সহানুভূতি সহকারে আচরণ করতেন এবং তাদের প্রত্যেককে এমনভাবে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিতেন যা তার সামাজিক পদমর্যাদার উপযোগী ছিলো। তাদেরকে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত করা হতো কিংবা করমুক্ত জমির স্বত্বদান করা হতো। এভাবে বহিরাগতগণ যখন ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় বর্ধিত হলো, তখন তারা বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং এদেশের প্রতিটি অংশে

তাদের বাসভূমি ও শান্তির নীড় প্রতিষ্ঠিত করলো। এই বিদেশাগত-দের সংখ্যা জন্মের মাধ্যমে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের পরিবারবর্গের সম্মেলন থেকে সহর, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর অস্তিত্বও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলার গৌড় রাজ্য দীর্ঘকালব্যাপী এতো বেশী শক্তিশালী ও উন্নত ছিলো যে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের দিক থেকে ইহা ছিলো অপ্রতি-দ্বন্দ্বী। গৌড় ছিলো বৃহৎ ও জনাকীর্ণ সহর। ইহা সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবার এবং শিক্ষা, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার জন্যে বিখ্যাত লোকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। একটি বৃহৎ স্থায়ী সেনাদলও সেখানে অবস্থান করতো। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সকলেই ছিলো বিদেশজাত মুসলমান। অধিকন্তু এই সহরে অন্যান্য শ্রেণীর মুসলমানও ছিলো। যেমন— পেশাদার, বণিক, কারিগর ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলতে গেলে যেখানে মুসলমান শাসন-ব্যবস্থা কায়েম ছিলো সেখানে প্রয়োজনীয় উপকরণও ছিলো, যেমন ছিলো শক্তিশালী সরকারী শাসনযন্ত্র এবং পরিচালনা করার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও পর্যাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। এদেশের রাজারাই কেবল মুসলমান ছিলেন এবং তাঁদের কোনো মুসলমান সভাসদ বা কর্মচারী ছিলো না, কিংবা তাঁদের মুসলমান সভাসদ বা কর্মচারী থাকলেও তাঁরা ছিলেন কেবল এদেরই নব-দীক্ষিত মুসলমান, এ ধরনের কথা চিন্তা করা ভুল হবে।[১]

---

১ রাজা গনেশ: উপরোল্লিখিত ঘটনার পরপরই এই জমিদার রাজা উপাধি গ্রহণ করে পাণ্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হন যেখানে হিন্দুগণ তাঁকে হিন্দু ধর্মের ও বাংলার শাসনদণ্ডের পুনরুদ্ধার কর্তা হিসেবে সাদরে গ্রহণ করলো। কিন্তু সিংহাসনারোহণের পর তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁর স্বধর্মীয় প্রজাদের চাইতে মুসলমানগণ সংখ্যায় এতো অধিক

বাংলার পূর্বেকার শাসকগণ তাঁদের আনুক্রমিক রাজত্বকালে পৃথিবীর সব দেশ থেকে তাঁদের স্ববংশীয় ও স্বধর্মাবলম্বীদেরকে তাঁদের রাজ্যে এসে বসবাস করতে প্রবৃত্ত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিলো এদেশে তাঁদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি ও মজবুত করা এবং এই বহিরাগতদের দ্বারা সহর, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী জনাকীর্ণ করা। অধিকন্তু বহিরাগতদের মধ্যে যারা এই শাসকদের দ্বারা বেসামরিক ও সামরিক পদে নিযুক্ত হতেন তাদের প্রত্যেকেরই মুসলমান আত্মীয়-স্বজন ও নিজস্ব অনুচরের দল ছিলো। এরূপ ব্যবস্থা দীর্ঘকালের জন্যে অর্থাৎ যতদিন গৌড় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিলো ততদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। কিন্তু মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময় যখন এই ভারত সাম্রাজ্য বিপর্যয় ও বিভেদের মুখে, তখন গৌড় সামগ্রিক ধ্বংসে জড়িয়ে পড়ে। এর অধিবাসিগণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি লোক সেই সমস্ত গ্রামে ও পল্লী অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যেখানে সে নিরাপদে পা রাখার মতো আশ্রয় পেতে পারে আর নিজেকে ভরণপোষণ করার মতো কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে। যাঁরা নিষ্কর ভূসম্পত্তি কিংবা সে ধরনের সুবিধার অধিকারী ছিলেন তাঁরা সে সমস্ত অধিকার নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন

এবং সাহসিকতায় এতো বেশী উর্ধ্বে যে, তিনি মুসলমানদের সংগে কোমল ও শিষ্ট আচরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করলেন। কাজেই তিনি অধিকাংশ আফগান সর্দারকেই তাঁদের ভূসম্পত্তি তাঁদের নিজেদের দখলে রাখার জন্যে অনুমতি দান করেন এবং শিক্ষিত ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্যে পেনসন মঞ্জুর করেন। এ সমস্ত উপায়ে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সাত বছর কাল এদেশ শাসন করেন এবং ৭৯৪ হিজরিতে অর্থাৎ ১৩৯২ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।— History of Bengal : By C. Stewart, p. 60 দ্রষ্টব্য।

এবং অবসরণে ও শান্তিতে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন ; অপর পক্ষে যাঁরা সামরিক পেশায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা বেকার হয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্যে চাষাবাদের পেশা গ্রহণ করেন।

বংগদেশ তৈমুরের বংশের কর্তৃত্বাধীনে আসার পূর্বে যেসমস্ত মুসলমান এদেশে আগমন করেছিলেন, উপরোক্ত বিবরণগুলি তাঁদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠালাভের পর তাঁদের নিজেদের লোক বাংলাদেশে আগমন করতে থাকে। সর্বশ্রেণীর ও সর্বসম্প্রদায়ের অসংখ্য মুসলমান সময় সময় বিভিন্ন পথে এদেশে আগমন করে এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যক্তিগত অবস্থার উপযোগী করে কোনোরূপে এদেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করে। এসমস্ত মোগল শাসকের শাসনকালে অধিকাংশ বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীকেই বহিরাগতদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হতো এবং উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের বিদেশী মুসলমানদেরকে এদেশে বসবাস করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করার যে নিয়ম পূর্বগামীদের শাসনামলে প্রচলিত ছিলো, মোগল সম্রাটদের দ্বারাও তা অনুসৃত হতো ; অর্থাৎ তাঁরাও শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদেরকে মদদ-ই-মা'শ ও জায়গির মঞ্জুর করেন এবং তাঁদের সংগে সম্মান ও গুরুত্ব সহকারে ব্যবহার করে এদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন।[১] অধিকন্তু তাঁরা

১ আকবরনামা, ২য় খণ্ডে পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলির (বাংলার) ওপর আফগানদের উপর্যুপরি আক্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখনকার বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার শাসক সোলেমান শাহের মৃত্যুর পর দাউদ খান সিংহাসনে আরোহণ করলে মোগল সম্রাট মহামতি আকবর তাঁর সিংহাসন আরোহণের সতেরো বছরে খান খানান মোনায়েম খানকে বাংলা আক্রমণ করার জন্যে আদেশ দেন। উনিশ বছরে

পূর্ববর্তী সরকারের অধীনস্থ মুসলমানদের সংগে সহৃদয়তা ও উদারতা প্রদর্শন করেন এবং সেই মুসলমানগণ আগে যে সমস্ত জমির স্বত্ব

খান খানান বাংলা আক্রমণ করেন এবং পরাজিত দাউদ খান তাঁর দলবলসহ তাণ্ডা (গৌড়ের নিকটস্থ বাংলার রাজধানী) থেকে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর দিকে (হুগলী, ঢাকা ও দিনাজপুরের দিকে) পলায়ন করেন; দাউদ খান নিজে সাতগাঁও কিংবা হুগলীতে পলায়ন করেন। একুশ বছরে দাউদ খান বাংলার তৎকালীন সুবাদার খান জাহান কর্তৃক বন্দী ও নিহত হন। জনসাধারণ মোগল সম্রাটের শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এভাবে সমগ্র দেশে শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়—যে দেশ স্মরণাতীতকাল থেকে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের কারণে যুদ্ধোপযোগী স্থান বলে অভিহিত হতো, যা এদেশকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করতো।

আকবরের রাজত্বের বাইশ বছরে নিহত দাউদ খানের মাতা তাঁর সমস্ত পোষ্যসহ সম্রাটের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করেন এবং তাণ্ডার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে ব্যক্তিগত-ভাবে মহামান্য সম্রাটের সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্যে অনুমতি লাভের প্রস্তাব করেন। খান জাহান তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাঁর নিজের কর্মস্থলে ফিরে আসেন। তেইশ বছরে খান জাহান সম্রাটের নিকট এই মর্মে খবর পাঠান যে, বাংলার জনসাধারণ দিল্লীর সম্রাটের শাসনকে মেনে নিতে সম্মত হয়েছে এবং এই শাসনের মধ্যে তাদের সমৃদ্ধি ও কল্যাণের উৎস দেখতে পেয়ে তারা হৃষ্টচিত্তে সম্রাটের হিতকর আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানাধীনে নিজেদেরকে ন্যস্ত করেছে। আর দাউদের মাতা তাঁর সমস্ত দলবলসহ এবং মাহমুদ খানসহ আরো অনেক বিদ্রোহী আফগান মোগল সম্রাটের আশ্রয়াধীনে এসেছে।

(আকবর নামা, ২য় খণ্ড) একথা উল্লিখিত হয়েছে যে সম্রাটের রাজত্বকালের আটাশ বছরে বাংলা দেশ যখন তৃতীয়বারের মতো আক্রান্ত হয় তখন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকেরা সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয়

ও ভাতা ভোগ করতেন সেগুলির অধিকাংশই বহাল রাখেন। বাংলার পূর্ববর্তী শাসকদের মতো মোগল সম্রাট ও সুবাদারগণও

কথা ও প্ররোচনামূলক বাগ্মিতার দ্বারা এবং আশাপ্রদ নিশ্চয়তাসহ জনসাধারণের হৃদয় জয় করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যাদুর মতো ক্রিয়াশীল কথার সাহায্যে তাঁরা জনসাধারণকে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করার চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। খালাদিন খান সর্বপ্রথম সম্রাটের ক্ষমতার নিকট রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং পরে মির্যা বেগ, জাহাযি খান এবং আরো অনেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সম্রাটের শাসনের নিকট স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকারের প্রস্তাব পাঠান। তাঁরা এই মর্মে সম্মত হয়েছিলেন যে তাঁরা যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে তাঁদের ঘরে ফিরে যাবেন এবং কিছুদিন পর তাঁরা দরবারে এসে হাজির হবেন ও ভালো কাজ করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন। মির্যা বেগ খালাদিন খান, ওয়াযির জামিল এবং অন্যান্যেরা তাঁদের বিঘোষিত আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ প্রতিশ্রুত চাকরির জন্যে সশরীরে হাজির হন। উনত্রিশ বছরে শাহ্‌বাজ খান যখন বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং সাদিক খান বাংলা দেশ থেকে সম্রাটের নিকট গমন করেন, তখন ওয়াযির জামিল, খালাদিন খান, ফররুখ এবং অন্যান্যের মধ্যে যাঁরা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তাঁদের পূর্বেকার খারাপ আচরণের জন্যে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে কাটাতেন, তাঁরাও সাদিক খানের মধ্যস্থতায় সম্রাটের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশায় তাঁর সহগামী হন। সম্রাটের নিকট এ সংবাদ পৌঁছামাত্র সাদিক খানকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার এবং তখন উড়িষ্যায় কতলু খানের সংগে যুদ্ধরত ওয়াযির খানের সংগে তাঁকে যোগদান করার জন্যে আদেশ দিতে মহন্দসকে পাঠানো হলো। তাছাড়া শরণার্থীদেরকে রাজকীয় ক্ষমা দানের আদেশসহ দরবারে আনার জন্যেও তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো। মহন্দস সাদেক খানের সংগে তাণ্ডায় সাক্ষাৎ করেন এবং সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী ওয়াযির খানের সংগে অবিলম্বে যোগদান করার

তাঁদের নিজস্ব জাতি ও ধর্মমতাবলম্বী লোকদের এদেশে প্রবেশ করান এবং এদেশের সর্বত্র তাদেরকে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্যে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। সাদেক খান শরণার্থীদেরকে সংগে নিয়ে দরবারে যাওয়ার জন্যে এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তাঁর পুত্র যাহেদকে পাঠালেন। ঠিক সময়ে তাঁরা রাজধানীতে পৌঁছেন এবং সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে সম্রাটের ক্ষমা লাভ করেন ও বিভিন্ন দানসহ সম্মানিত হন। পুনশ্চ, এ বছরের বিবরণে (আকবরনামা, ২য় খণ্ড) একথা লিপিবদ্ধ আছে যে, মাসুদ খান নামক বাংলার একজন শক্তিশালী ও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আনুগত্য স্বীকারের জন্যে উপদেশ দেয়া হলে তিনি তা পালন করেন। সোনার গাঁয়ের জমিদার ঈসা খান রাজকীয় ক্ষমা লাভের আশায় সাদেক খানের নিকট তাঁর প্রতিনিধি পাঠান। এ কথা স্থির হয় যে মাসুদ খানকে হেজাযে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী হবেন এবং প্রতিভূস্বরূপ তিনি তাঁর একজন নিকট আত্মীয়কে কিছু বাছাই করা উপহারসহ দরবারে পাঠাবেন। তাছাড়া যুদ্ধের সময় তিনি শাহী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে যে সমস্ত জিনিস বলপূর্বক কেড়ে নিয়েছিলেন তা সবই ফেরৎ দেবেন। সম্রাট পূর্বোক্ত শর্তসমূহ গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী ঈসা খান যে সমস্ত হাতী, কামান ও ধনরত্ন আটক করেছিলেন তা সবই রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি যদিও মাসুদ খানকে হেজাযে পাঠাননি, তথাপি তাঁর অবাধ্য ও ক্ষতিকর প্রবণতা দমন করেন। ত্রিশ বছরে বাংলার সুবাদার শাহবায খান প্রেম ও স্নেহপূর্ণ ভাষায় ও আশ্বাসবাণীর দ্বারা জন-সাধারণের হৃদয় জয় করেন এবং তাদের আনুগত্য লাভ করেন। এভাবে তিনি খুব শীগগিরই অবাধ্য লোকদেরকে বাধ্যতা ও আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। এভাবে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির হাসি ফুটে উঠে এবং এদেশ থেকে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেয়।

ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা তাঁরা তাঁদের শাসনের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিধান করেন।[১]

এদেশে কিছুদিন প্রবাস জীবন-যাপনের পর মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার রীতি মুসলমান বহিরাগতদের মধ্যে ছিলো না; কিন্তু পক্ষান্তরে দেশের যে কোনো অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অপরিবর্তনীয় অভ্যাস তাদের মধ্যে ছিলো, যেখানে তারা স্বচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলো এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজে পেয়েছিলো।

আকবরের রাজত্বের সাঁইত্রিশ বছরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিলো সেগুলির উল্লেখ করে একই লেখক বর্ণনা করেছেন যে দেশের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়েছিলো এবং উড়িষ্যা প্রদেশকে মোগল শাসনের অধীনে আনা হয়েছিলো। জমিদারগণ আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করেছিলেন। তাঁদের এ আবেদন রক্ষিত হয়েছিলো এবং সমগ্র দেশকে স্পষ্ট আনুগত্যাধীনে আনা হয়েছিলো। কতলু খানের পুত্রগণ, খাজা সোলেমান, দেলোয়ার খান, জালাল খান, বাহাদুর ঘোর, আলিফ খান, আবদুল গফুর, মালিক হায়বৎ, মালিক দাউদ, মালিক সেকান্দর, হাবিব খান, দরিয়া খান, শূজাদিল, মেওয়া খান প্রমুখ বাংলার সর্দারগণ সম্রাটের আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

১ সামরিক কাজের পদ্ধতি মোগলদের ইচ্ছোপযোগী ছিলো এবং প্রতিষ্ঠি সর্দার আনুক্রমিকভাবে নিজেকে এবং তাঁর আশ্রিত জনকে সেই জেলার প্রতিষ্ঠিত করতেন, যে জেলায় তিনি সর্বপ্রথম নিয়োজিত হতেন। মৃত সুবাদার খানজাহান কেবল আফগানদেরকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে উৎকন্ঠিত হয়ে তাঁদেরকে শান্তভাবে অধিকার-ভোগ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন।—History of Bengal : By C. Stewart, p. 107 দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত ঘটনা ও উক্তিগুলি খণ্ডন করার মতো অথবা এদেশের অধিবাসীরা বলপ্রয়োগের ফলে কিংবা স্বেচ্ছায় এককালীন কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তা দেখাবার মতো কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। গৌড়ের রাজাদের বংশধরগণ কিংবা এদেশে আগত যেসমস্ত মুসলমানের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে সেসমস্ত মুসলমান কিংবা তাদের বংশধরগণ কখনো বাংলাদেশ পরিত্যাগ করেছে, সে সম্পর্কেও কোনো লিখিত প্রমাণ নেই।

মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের হিসাব দিতে গিয়ে স্যার ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার তাঁর 'Statistical Account of Murshidabad' গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথায় একটি অনুমিত ধারণার সৃষ্টি করেছেন, 'কথিত আছে যে বাংলাদেশ যখন ইংরেজদের করায়ত্ত হয় তখন প্রধান মুসলমান পরিবারগুলি দিল্লী কিংবা পারস্যে প্রত্যাবর্তন করে।' এ বিষয়ের ওপর হান্টার সাহেবের মন্তব্য এমনই ভ্রান্তিপূর্ণ যে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। ইহা একটি সুস্পষ্ট ঘটনা যে ইংরেজদের কর্তৃক বাংলা জয়ের অব্যবহিত পূর্বে এদেশের শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খল অবস্থা বিদ্যমান থাকায় তখন একটি শক্তিশালী ও যোগ্য সরকারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিলো সর্বাপেক্ষা বেশী। কাজেই বাংলাদেশ যখন বৃটিশ শাসনাধীনে আসে, যার ফলে দেশে শান্তি ফিরে এলো ও এর অধিবাসীরা পেলো আশ্রয়, তখন প্রধান মুসলমান পরিবারগুলি দিল্লী কিংবা পারস্যে সরে যাওয়ার মতো অসন্তুষ্ট হতে পারেনি। ইংরেজ জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে সহিষ্ণুতার শক্তি, তা কেবল মুসলমানদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় স্বাধীনতাই দান করেনি, উপরন্তু তাদের নিজস্ব আইন ও মূলনীতির দ্বারা শাসিত হবার স্বীকৃতিও তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। রাষ্ট্রীয় চাকরি এদেশের প্রজাদেরকে মর্যাদায় ও সম্পদে উন্নীত করেছিলো

বলে তা প্রধান মুসলমান পরিবারগুলিকে বাংলাদেশে থাকার জন্যে আকৃষ্ট করেছিলো; কারণ ইংরেজেরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মুসলমানেরা সম্মানজনক ও দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন এবং দেশের শাসনকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন ও সেই ভাষার বিরুদ্ধে অন্ধভাবে পোষিত মুসমমানদের কুসংস্কার এবং সর্বশেষে সরকারী চাকরির নতুন বিধিব্যবস্থা মুসলমানদেরকে তাদের পূর্বের মর্যাদা ও পদ থেকে বঞ্চিত করে এবং পরিশেষে তাদেরকে তাদের বর্তমান দারিদ্র্য ও বিস্মৃতির গভীরতায় উপনীত করে। যিনি বাংগালী মুসলমানদের ইতিহাস গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছেন তিনিই দেখতে পাবেন যে বাংলার নওয়াব নাযিম মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে যে সমস্ত প্রধান মুসলমান পরিবার মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন, তাঁদেরকে এখনও বহু সংখ্যায় মুর্শিদাবাদ, পাটনা, পুর্নিয়া, ঢাকা, হুগলী প্রভৃতি শহরে এবং এসমস্ত জেলার গ্রামগুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে; এদেশের প্রাচীন শাসকগণ তাঁদের যে 'সনদ' প্রদান করেছিলেন তা এখনও রক্ষিত আছে এবং যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি (যদিও সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত) ঐ শাসকদের কাছ থেকে দান হিসেবে পেয়েছিলেন তা এখন পর্যন্ত তাঁদের বংশধরদের অধিকারে আছে। এভাবে একথা বোঝা যায় যে, বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কে হান্টার সাহেবের মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য। অবস্থা এরূপ হওয়ায় একথা নিরাপদে ও বিরুদ্ধ উক্তির ভয় না করে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, এদেশের বর্তমান মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ নিঃসন্দেহে সেই মুসলমান ছিলেন যাঁরা পূর্ববর্তী শাসকদের রাজত্বকালে বিদেশ থেকে এদেশে আগমন করেছিলেন এবং বর্তমান মুসলমান জাতি-

সেই প্রবল জাতিরই বংশধর, যে জাতি ৫৬২ বছরের জন্যে এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেয়া যায় যে, বর্তমানকালের মুসলমানেরা ঐ সমস্ত বিদেশী মুসলমান শাসক ও ঔপনিবেশিকদের বংশধর নয়, তাহলে সেই বিদেশী মুসলমানদের সন্তান-সন্ততি কা'রা হতে পারে এবং তারা কোথায় চলে গেছে? মূলতঃ কনৌজ থেকে বাংলায় আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন সূদ্রের বংশধরেরা (যেরূপ কথিত আছে) যদি এমন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে যে তাদেরকে দেশের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সেকথা বিবেচনা করে দীর্ঘকালব্যাপী যে অসংখ্য মুসলমান এদেশে আগমন করেছিলো তাদের বংশধরগণ যে ব্রাহ্মণ ও সূদ্রদের চাইতে সংখ্যায় অনেক বেশী হবে তা স্বীকার করার মধ্যে কি অসুবিধা থাকতে পারে!

যুক্তিকে এই পরিণত স্তরে আনার পর আমরা এখন বিশ্বাস করতে পারি যে, পাঠকগণ সামান্য চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, কারুর পক্ষে একথা তর্ক করা কতটুকু ন্যায়সংগত ও যথার্থ হতে পারে যে 'বাংলার মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ এদেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছিলেন, যাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।'

মিঃ এইচ. বেভার্লি তাঁর 'Census Report of Bengal for 1872' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৩২, প্যারা ৩৪৮) নিম্নোক্ত বিবরণে যে ভুল ও ভিত্তিহীন মতবাদের প্রচার করেছেন তা থেকেই বাংলার মুসলমানদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে হাণ্টার সাহেব প্রমুখ খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদের ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে—

> কিন্তু সম্ভবতঃ বদ্বীপের এই অংশে মুসলমান ধর্মীয় উপাদানের সীমাহীন প্রতিপত্তির প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া

যাবে নিম্ন সম্প্রদায়ের অগণিত লোকদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মধ্যে, যাদের দ্বারা এদেশ পূর্ণ ছিলো। মুসলমানেরা তরবারির মতো কোরান সংগে নিয়েও দেশ জয় করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ কথিত আছে যে, সুলতান জালাল উদ্দীনের অধীনে হিন্দুগণ যে নির্যাতন ভোগ করতো তা প্রায় ধ্বংসেরই সামিল ছিলো। আবার, হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ-প্রথা স্বভাবত:ই নিম্নতর সম্প্রদায়কে এমন একটা ধর্ম পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করতো, যার অধীনে তারা ঘৃণিত জাতিচ্যুত ব্যক্তিদের চাইতেও নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতো এবং এমন একটা ধর্মে তারা দীক্ষা নিতো যা সর্বস্তরের মানুষকে সমান বলে স্বীকৃতি দিতো। প্রকৃতপক্ষে একথা স্পষ্ট নয় যে নিম্নতর শ্রেণীর এই ধর্ম পরিবর্তন দেশের অন্য অংশের চাইতে আমাদের আলোচ্য অংশে এতো বেশী সাধারণ ব্যাপার ছিলো কেন, যদিও গৌড় ও ঘোড়াঘাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য স্বভাবতঃ কল্পনার সম্ভাবনাকেই বৃদ্ধি করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধর্ম পরিবর্তন বিষয়টি সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। কিন্তু সেই ধর্ম পরিবর্তন বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে চলেছিলো যা কেবল সম্ভাব্য মত বলেই বোধ হয় না ; বরঞ্চ বর্তমানে এখানে যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান দেখা যায়, যারা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের মতো সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারী, এই ধর্ম-পরিবর্তনই ছিলো তার একমাত্র কারণ।

স্তবক ৩৫২—যাহোক, বাংলা দেশে ইহা তদ্রূপ ছিলো না। সেখানে মুসলমান আক্রমণ হিন্দুধর্মকে দুর্বল ও অনিশ্চিত ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল দেখতে পেলো, কেবল

একটি তুর্বল গ্রহণ-শক্তি বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর মন ও অনুভূতির ওপর কার্যকরী ছিলো। কেবলমাত্র আর্য সম্প্রদায় প্রথম থেকেই দেশের অনার্য বংশধরদের স্থানচ্যুত করে উত্তর ভারত থেকে খাঁটি আর্যরক্তের অবিরাম আমদানীর দ্বারা এর নিজস্ব রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতো। স্বয়ং হিন্দুধর্ম ছিলো এমন একটা নীচ ও মর্যাদাহীন গোছের জাতি, যা আদিম অধিবাসীদের বর্বরোচিত রীতি ও কুসংস্কারগুলি উপলব্ধি ও অবলম্বন করতে উৎসাহিত হয়ে তার আবেষ্টনীর মধ্যে সেগুলিকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করতে চেষ্টা করতো। একই সময়ে এই বিপুল জনসমষ্টি নিজেদেরকে একটি উন্নততর জাতির কাছে ভূমিদাসের পদাধিকারী হিসেবে দেখতে পেলো, যারা পশুবলের সাহায্যে তাদেরকে পরাস্ত করেছে এবং যাদের সামাজিক ব্যবস্থায় তাদের জন্যে কোনো স্থান নেই। তার ছিলো একদল প্রভুর জন্যে কেবল কাঠুরিয়া ও জনসংগ্রহকারী যে প্রভুদের চোখে তারা নোংরা পশু ও সম্পূর্ণরূপে ঘৃণার পাত্র বলে বিবেচিত হতো। এদেশ সমুদ্র-বেষ্টিত বলে পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুদের মুখের সম্মুখে অধিক দূর পলায়ন করার মতো আর পথ তাদের নিকট খোলা ছিলো না। এমন কি আর্যেরাও যদি কোনো দিন তাদেরকে বিতাড়িত করার জন্যে প্রচণ্ড বেগে বাংলা দেশের সর্বশেষ সীমান্ত পর্যন্ত প্রবেশ করতো, তথাপি নয়। কিন্তু হিন্দুস্তানের মুসলমান বিজেতাগণ যখন কোরান ও তরবারি নিয়ে নিম্নতর বদ্বীপ আক্রমণ করে, তখন একথা ভালোভাবেই অনুমান করা যায় যে তারা যে সম্পূর্ণরূপে অভ্যর্থিত হয়নি এমন কথা বলা চলে না। সে যাই হোক, তারা একটি ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি তাদের

সংগে এনেছিলো, যার অধীনে ঘৃণিত ও সমাজচ্যুত জাতি হওয়ার পরিবর্তে বাংলার অর্ধ-উভচর আদিম অধিবাসীরা তাদের পূর্ব প্রভুদের সমান না হলেও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদা অধিকার করতে পেরেছিলো। আমরা অনুমান করতে পারি যে, বাংলার এই দুর্দশাগ্রস্ত ভূমিদাসগণের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তন করতে খুব কম উৎপীড়নেরই প্রয়োজন হয়েছিলো। যে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে উৎপীড়নের নিজস্ব স্বাভাবিক শক্তি কদাচিত সফলকাম হয়েছে। একমাত্র অত্যাচারের দ্বারা বিপ্লব ঘটানোর পূর্বে দেশের সময় ও আর্থিক অবস্থা অবশ্যই এর উপযোগী হয়ে থাকে। বিহারে এই বিপ্লব সফলকাম হয়নি, কারণ একে প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা হিন্দু ধর্মের যথেষ্ট ছিলো। বাংলা দেশে হিন্দুধর্মের শক্তিতে ভাঁটা পড়েছিলো এবং বিপুল জনসংখ্যা হিন্দু-ব্যবস্থাধীনে তাদের হীন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে মুহম্মদের ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছিলো।

স্তবক ৩৫৩—বাংলার বদ্বীপের মুসলমানদের উৎপত্তির জন্যে বিদেশী রক্ত প্রবর্তনের চাইতে যে ধর্মান্তকরণই অধিকতর দায়ী, একথার আরো প্রমাণের প্রয়োজন হলে তা মুসলমান এবং তাদের স্বদেশবাসীদের, যারা এখনো নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত তাদের, মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থেকে দেয়া যেতে পারে বলে মনে হয়। তারা উভয়েই যে মূলতঃ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একথা যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট বলে মনে হয়। তারা উভয়েই যে একই দৈহিক গঠনের অধিকারী কেবল তা থেকেই নয়, তাদের বিশিষ্ট চালচলন ও রীতি-নীতির সাদৃশ্য থেকেও একথা স্পষ্ট।

স্তবক ৩৫৪—কিন্তু একজন চণ্ডাল কিংবা রাজবংশী এবং একজন বাংগালী মুসলমানকে একসংগে দাঁড় করালে যদি তাদের পোশাকের কিংবা চুলছাঁটার ধরনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য না থাকতো তাহলে তাদের পরস্পরকে পৃথক মনে করা কঠিন হতো। সম্ভাব্য ধারণা এই যে, তারা এক ও অভিন্ন জাতি এবং কেবলমাত্র বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তারা একই ধর্ম অনুসরণ থেকে বিরত রয়েছে।

মিঃ বেভার্লি নিজে যে কাল্পনিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তাতে আমরা বিস্মিত হয়েছি, যা ঐতিহাসিক প্রমাণাদির দ্বারা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। একথা সর্বত্রই স্বীকৃত যে ইতিহাসই একমাত্র প্রমাণ্য চিত্র যদ্দারা আমরা পৃথিবীর অতীত ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হতে পারি এবং বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর, গুরুত্বপূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর উভয় ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা তাতেই থাকে। অতএব মিঃ বেভার্লির মতবাদগুলির সম্বন্ধে যে কোনো জাতির ইতিহাস থেকে সমস্ত প্রমাণের অভাবে আমরা সেগুলির যাথার্থ্য গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অপারগ। তর্কের খাতিরে যদি একথা সমর্থন করা হয় যে তখনকার ঘটনাবলী পূর্ণ ও ব্যাপকভাবে রক্ষিত হয়নি কিংবা ঐধরনের ঘটনাবলীর উল্লেখ স্বেচ্ছাকৃতভাবে অথবা অমনোযোগিতার জন্যে ভুলবশতঃ অথবা অন্য কোনো কারণে বাদ পড়ে গেছে, তাহলে এ অবস্থায় আমাদের জবাব হবে এই যে মুসলমানযুগের এমন কোনো অংশ নেই যার ঘটনাবলী পরিপূর্ণভাবে ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। মিঃ বেভার্লি কর্তৃক উল্লিখিত ঘটনাবলীর চাইতে সুলতান মাহমুদের রাজত্বকালের বিবরণের মতো অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীও যখন ইতিহাসে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে, তখন মুসলমান বিজেতাদের বলপ্রয়োগের

অধীনে বাংলার হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তনের মতো অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে ঐতিহাসিকদেরকে কে বাধা দিয়েছিলো ?

মিঃ বেভার্লির বর্ণিত ঘটনাবলী যদি সত্য হতো, আর পূর্বের ইতিহাসে সেগুলির উল্লেখ যে কোনো কারণে বাদ পড়তো, তাহলে সেগুলি নিশ্চয়ই সম্রাট আকবরের আদেশে লিখিত 'তবাকাৎ-ই-আকবরী' ও এ ধরনের গ্রন্থাবলীতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতো দৃষ্টি আকর্ষণ করতো ; এসকল গ্রন্থে বাংলার আগেকার রাজাদের শাসনামলের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত আছে। আকবর সার্বিকভাবে একজন ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত সম্রাট হিসেবে বিবেচিত। তথাপি এ সম্রাটের নির্দেশে লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে কিংবা অন্য যে কোনো জাতির ঐতিহাসিক নথিপত্রে মিঃ বেভার্লি কর্তৃক উত্থাপিত মতবাদের সমর্থন নেই। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুসলমানগণ তরবারি ও কোরানসহ নিম্নবংগ আক্রমণ করে তখন এদেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ বর্ণ হিন্দুদের ঘৃণা ও অপমানের পাত্র ছিলো ; তারা অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিলো, সমাজে তাদের কোনো মর্যাদা ছিলো না, তারা তাদের প্রভুদের জন্যে 'কাষ্ঠ সংগ্রহ করতো ও জল টানতো' এবং এসকল কারণে তরবারি ও কোরানের শক্তির সাহায্যে তারা সহজেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এ বিবরণ আপত্তিজনক ; কারণ যদি হিন্দুদের নিম্ন সম্প্রদায়গুলিকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তাহলে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদার অধিকারী বর্ণহিন্দুদের পক্ষে এই বাধ্যতামূলক ধর্মান্তরিত-করণের কঠোরতা থেকে মুক্তিলাভ করা এবং এদেশে নিজেদের ধর্ম মতে অনুগত থাকা কি করে সম্ভবপর হয়েছিলো ? যদি মুসলমান বিজেতাগণ একহাতে কোরান ও অপর হাতে তরবারি ধারণ করে

দেশীয় লোকদেরকে ইসলামের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্যে বলপ্রয়োগ করতেন, তাহলে দিনের পর রাত্রি আসে একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মতো বর্ণ হিন্দুদেরকেও মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মে পরিবর্তিত করতে পারতেন।

পাইকারীভাবে ধর্মান্তকরণ নীতির জন্যে বাংলার মুসলমান বিজেতাদের প্রতি দোষারোপ করে মিঃ বেভার্লি যে উক্তি করেছেন তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে এবং তাঁর দুঃখজনক ক্রটিগুলিতেও এমন কি এ ধরনের উক্তিতে যে অসাধুতা জড়িয়ে আছে তা প্রকাশ করার জন্যে আমি নিম্নে অন্যান্য খ্রিস্টান লেখকের মতামত উদ্ধৃত করছি। এভাবে পাঠকগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, ইহা সাধারণভাবে সর্বত্রই মুসলমান বিজয়ীদের রীতি ছিলো যে তাঁরা যে দেশ জয় করতেন সে দেশের অধিবাসীদেরকে তাদের নিজস্ব ধর্ম ও রাজনীতিতেই ছেড়ে দিতেন এবং তাদের জীবন-ধারায় হস্তক্ষেপ করতেন না। বিখ্যাত গ্রন্থকার Mr. Godfrey Higgins, যিনি এ বিষয়ে একজন প্রধান কর্তৃপক্ষস্থানীয়, এভাবে লিখেছেন—

> খলিফাগণ যে সমস্ত দেশ জয় করেছিলেন, সে সব দেশের অধিবাসীরা গ্রীক, পারসীক, সাবিয়ান কিংবা হিন্দু যাই হোক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা হয়নি, যে কাজের নিদর্শন খ্রীস্টানদের মধ্যে পাওয়া যায়। মুসলমানদের বিজয়পর্ব সমাপ্তির পর তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পত্তি ও ধর্মের শান্তিপূর্ণ অধিকারে ছেড়ে দেয়া হতো।"

John Devenport তাঁর 'Apology for Mahamed and the Koran' নামক গ্রন্থে লিখেছেন "ভারতবর্ষে মুসলমান

বিজেতাগণ অন্যান্য ধর্মের স্বাধীন চর্চার পরিপন্থী কিছু কাজ করলেও তারপরেই সেই সভ্য ও উন্নত দেশের ধর্মমন্দিরগুলি যেভাবে ছিলো সেভাবেই থাকতে দিয়েছিলেন।

আরেকজন লেখক East and West জার্নালে প্রকাশিত 'Islam as a political system' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন :

> ইসলাম অন্য কোনো ধর্মীয় মতবাদের ওপর কখনো হস্তক্ষেপ করেনি, কখনো নির্যাতন করেনি, কখনো কোনো ধর্মমত সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তা দমন করার উদ্দেশ্যে আদালত স্থাপন করেনি, এবং কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা করেনি। সে তার ধর্ম দিতে চেয়েছে, কিন্তু কখনো একাজে বলপ্রয়োগ করেনি।

একই লেখক মন্তব্য করেছেন :

> এর (অসহিষ্ণুতার) ঠিক বিপরীত ধর্মী চেতনা ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, কিংবা যে সব দেশে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে সেগুলির প্রতিটিতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এজন্যে প্যালেস্টাইনে একজন খ্রিস্টান কবি (Lamertine), আমরা যে ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করছি সেগুলির বারো শতাব্দী পরে, বিস্ময়াবেগে বলেছেন, 'পৃথিবীর বুকে মুসলমানরাই একমাত্র সহিষ্ণু জাতি'; এবং একজন ইংরেজ পর্যটক (Slade) অতিরিক্ত সহিষ্ণু হওয়ার জন্যে মুসলমানদের নিন্দা করেছেন।

পাঠকগণ ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখুন যে এ সমস্ত নিরপেক্ষ খ্রিস্টান সমালোচকদের মতগুলি মিঃ বেভার্লির অন্তঃসার শূন্য উক্তিগুলির বিপরীত।

এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা যে সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজে স্থান না পাওয়ার জন্যে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ সমমর্যাদার অধিকার লাভ করার ও বর্ণভেদের অনুপস্থিতির জন্যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলো এখন তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

প্রতিটি বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মন ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে যে কোনো পার্থিব প্রলোভনই, তা যতোই জোরদার হোক না কেন, কাউকে তার পৈতৃক ধর্ম বিসর্জনে প্ররোচিত করতে এবং অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণে প্রবৃত্ত করতে পারে না। জীবদ্দশায় একজন লোকের অবস্থা যতো নীচ ও হীনই হোক না কেন সে পৃথিবীর যাবতীয় আর্থিক লাভের চাইতে তার ধর্মকে অধিক মূল্যবান মনে করে তৎপ্রতি অবিচল থাকে। যদি মিঃ বেভার্লির ধারণা সঠিক হতো তাহলে উচ্চ ও নীচ সম্প্রদায়ের সমস্ত হিন্দুই সমানভাবে মুসলমান আধিপত্যের সময় পার্থিব সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতো ; যদি তা-ই হতো তাহলে বর্তমানে এদেশে যে অসংখ্য হিন্দুধর্মাবলম্বী লোক রয়েছে তাদেরকে খুব কম সংখ্যায় দেখা যেতো ; কিংবা তা সত্ত্বেও তাদের কেউ যদি দেশের কোনো দূরবর্তী অথবা নির্জন এলাকায় থাকতো তাহলে এই অবশিষ্ট সংখ্যা মিশনারীদের যীশুর বাণী বা সুসমাচার সংক্রান্ত প্ররোচনার নিকট নিশ্চয়ই আত্ম-সমর্পণ করতো এবং সভ্যতার শিক্ষা ও চর্চা আর ঐসমস্ত মিশনারীর সাহায্যে জীবিকানির্বাহের উপায় দেখতে পেয়ে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করার জন্যে প্রলুব্ধ হতো। অধিকন্তু সেই মর্যাদার সমতা অর্জন করতেও তারা প্রলুব্ধ হতো, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যার অস্তিত্ব ইসলাম ধর্মানুসারীদের মধ্যে যতটুকু, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও ঠিক ততটুকুই আছে বলে বিবেচিত হয়।

একজন নিম্নবর্ণের হিন্দু পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়ার ফলে অধিকাংশ মুসলমানের সংগে মর্যাদার সমতা অর্জন করে, মিঃ বেভার্লির এই মত কেবল মুসলমানদের রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বভাবতঃই সকল মুসলমান একই সমতলে অবস্থান করে। কিন্তু ব্যবহার ও রীতিনীতি অনুযায়ী একজন লোকের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা ধর্মান্তরণের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমান ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ধর্মপরিবর্তনের পূর্বে সে যে মর্যাদার অধিকারী ছিলো ঠিক তদনুরূপ হয় এবং সে কেবলমাত্র সেই মুসলমানদের সংগেই মেলামেশা করতে পারে যারা তার নিজের মতো একই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামধর্ম গ্রহণের পর একজন নিম্নশ্রেণীর লোককে উচ্চবংশজাত মুসলমানদের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে কিংবা সমতা দাবি করতে দেয়া হয় না; কিংবা উচ্চবংশের একজন হিন্দু ইসলাম গ্রহণের জন্যে কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে বিয়ে করতে পারে না। মুসলমানেরা সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদার প্রতি সর্বদা কঠোর ও সযত্ন মনোযোগ দিয়ে থাকে।

বাংগালী মুসলমানদের মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠন, রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মিঃ বেভার্লি লিখেছেন যে এই মুসলমানদের কোনো একজনকে যদি চণ্ডাল বা রাজবংশীর সংগে তুলনা করা হয় তাহলে কেবল তাদের পোশাক ও চুলছাঁটার ধরন ব্যতীত তাদের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য বোঝা যাবে না। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে, যেখানে মুসলমানদের নৃকুলতত্ত্ব বিষয়ক দৈহিক অংশ ও বৈশিষ্ট্য-সমূহ আলোচিত হয়েছে দেখাবো যে এ উক্তি কতটুকু সত্য। কিন্তু এখানে আমরা কেবল একথাই বলছি যে বাংলার মুসলমানদের

মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠন এদেশের হিন্দুদের মুখাবয়ব ও দৈহিক গঠনের চাইতে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক এবং অধিকাংশস্থলে তাদের চাইতে উত্তম।

ইউরোপের লোকেরা ছদ্মবেশে আরব ও আযমদেশ পরিভ্রমণ করেছে ; সে দেশের অধিবাসীরা তাদেরকে আরব কিংবা আযম দেশীয় বলেই মনে করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১লা নবেম্বরের Illustrated London News সংখ্যায় প্রকাশিত বিখ্যাত পর্যটক স্যার রিচার্ড বার্টনের আরবী পোশাক পরিহিত প্রতিকৃতি সহ তাঁর পর্যটনের বিবরণে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শেখ আবদুল্লাহ্ এই ছদ্মনামে আফ্রিকা ও আরবদেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি এমন কৃতকার্যতার সহিত আরবী ভাষা ও কণ্ঠস্বর অনুকরণ করেছিলেন এবং তাঁর রীতিনীতি ও অভ্যাস, বাহ্যিক আকৃতি ও চালচলন এমন অভীষ্ট ফলপ্রদভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন যে তাঁকে বিদেশী বলে সেদেশের কেউ সন্দেহ করেনি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক মিঃ হেনরি পালমার বলেছেন যে, তিনি যখন মুসলমানী পোশাকে আরবদেশে ভ্রমণ করেছেন, তখন কেউ তাঁকে কখনো আবিষ্কার করতে পারেনি যে তিনি বিদেশী। মাত্র কিছুকাল আগে একজন ইংরেজ ছদ্মবেশে আফগানিস্তানে আগমন করেছিলেন এবং হিরাতের জামে মশজিদে পাঁচ বছর কাল ইমামতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউ তাঁকে আবিষ্কার করতে পারেনি যে তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান, মুসলমান নন।

এভাবে সামান্য অনুকরণ ও অস্থায়ী ছদ্মবেশ গ্রহণের দ্বারা এমন পুরোপুরিভাবে জাতীয় পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য লোপ করা সম্ভব হলে মিঃ বেভার্লি যদি এদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো

পার্থক্য বুঝতে সক্ষম না হন, যাদের পরিবার কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলা দেশে বাস করছে ও যাদের খাদ্য, রীতিনীতি, পোশাক ও মুখের ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাহলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং দৈহিক গঠন ও রীতিনীতির সাহায্যে প্রাপ্ত লক্ষণ সমূহের সাহায্য ব্যতীত কেবল অনুমানই আমাদের পক্ষে এই উপসংহারে উপনীত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট যে প্রায় ছয়শত বছরের জন্যে এদেশ মুসলমান শাসনাধীনে থাকার ফলে মুসলমানেরা এখন এরূপ অভিভূতকারী সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। একইরূপে একথা চিন্তা করা যুক্তির সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক মুসলমান, যেখানে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, সেই মালদহ জেলা ও এর আশেপাশের জেলাগুলিতে বাস করে, তারা সেই প্রাচীন রাজধানীর মুসলমান বাশিন্দাদের বংশধর। বাংলার মুসলমানদের রাজধানী সর্বপ্রথম ছিলো গৌড়ে। রাজধানী পরে রাজ-মহলে স্থানান্তরিত হয়। তারপর রাজমহল থেকে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে। বিপুল সংখ্যক মুসলমান এ সমস্ত জেলায় ও এগুলির চারিপার্শ্বস্থ জেলাগুলিতে দৃষ্ট হবে। এর থেকে একথাও বোধ হয় যে সম্ভবতঃ এ সমস্ত মুসলমান, কিংবা কমপক্ষে তাদের মোটা অংশ শাসক-সম্প্রদায়ের বংশধর, যারা পর পর এই দেশগুলি শাসন করে গেছেন।[১]

---

১ মুসলমানদের শাসনামলে গৌড়, তাণ্ডা, রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ পরপর বাংলার রাজধানী ছিলো এবং এসমস্ত স্থানে অধিকতর পরিমাণে মুসলমান জনসংখ্যার জন্য ইহাই দায়ী, কেননা মুসলমানেরা তাদের রাজধানীর আশেপাশে অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছিলো।

আমরা বলতে পারি না এ ধরনের অসত্য মতবাদ, দুঃখজনক ধারণা ও কল্পিত সন্দেহ প্রচারের দ্বারা মুসলমানদেরকে অপমান

সরকার ঘোড়া ঘাট—যেখানে এখন বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলা গঠিত হয়েছে; সরকার সাতগাঁও—যেখানে ২৪ পরগণা, নদিয়া ও হুগলী জেলা গঠিত হয়েছে; সরকার ফতেহাবাদ ও সরকার বগ্‌লা—যাতে যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সরকার সোনারগাঁও —যা এখন ত্রিপুরা ও নোয়াখালি নামে অভিহিত [ডক্টর ব্লকম্যানের History of Bengal সম্পর্কিত প্রবন্ধ] প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে মুসলমান জনসংখ্যা রয়েছে। উপরোল্লিখিত এলাকায় খুব বেশী সংখ্যক মুসলমানের আগমনকেই আকবর-নামা এর কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছে।

আকবর-নামা, ২য় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে যখন খান খানান মোনেম খান সম্রাটের রাজত্বকালের উনিশ বছরে সম্রাটের আদেশানুসারে বাংলা দেশ জয় করেন, তখন বাংলার রাজা দাউদ খান তাঁর অনুগামীদেরসহ সাতগাঁয়ের দিকে পলায়ন করেন এবং বাংলার সর্দার ও উচ্চপদস্থ আমিরগণ তাদের দলবলসহ সোনারগাঁ, ঘোড়াঘাট ও ফতেহাবাদের দিকে পলায়ন করেন। এভাবে প্রতিটি দল রাজধানী ত্যাগ করে (নিরাপত্তার জন্যে) বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেন। খান খানান রাজা তোডরমলের সহায়তায় তখনকার বাংলার রাজধানী তাণ্ডা অধিকার করে দেশ শাসন করতে থাকেন এবং তাঁর বিজয়ী সেনাদলকে সমগ্র বাংলা দেশের বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। মোহাম্মদ কুলি খান ও অন্যান্যেরা সাতগাঁয়ের দিকে, মজনু খান ও অন্যান্যেরা ঘোড়াঘাটের দিকে সেখানকার বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা দমন করার জন্যে প্রেরিত হন; মুরাদ খান ও অন্যান্যেরা ফতেহাবাদ ও বোগলার দিকে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রেরিত হন;

ও উপহাসের পাত্র হিসেবে প্রকাশ করার পরোক্ষ উদ্দেশ্য মিঃ বেভার্লির আছে কিনা ; কিন্তু আমরা যা বিশ্বাস করি তা হলো এই যে বাংলার মুসলমানদেরকে অতিরিক্ত সংখ্যায় দেখে এবং

সোনার গাঁ জয় করার জন্যে এবং সেখানে বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল দেখা দিতে পারে বলে তা দমন করার জন্যে ইতেমাদ খাঁ ও অন্যান্যকে নিয়োজিত করা হয়। সম্রাটের সেনাবাহিনী ও বাংলার সর্দারদের মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধ কয়েক বছরের জন্যে স্থায়ী হয়। যাহোক, অবশেষে বাংলার লোকেরা আশ্রয় প্রার্থনা করলো ও আনুগত্যের শপথ নিলো। তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো এবং তাদেরকে আশ্রয় দেয়া হলো। এই মর্মে আদেশ দেয়া হলো যে তারা যেখানে আছে সেখানেই তাদেরকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং তাদের ভরণপোষণের জন্যে তাদেরকে জায়গির নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। এই রক্ষিত সর্দারদের বসবাসের দরুনই বগুড়া পাবনা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চাটগাঁ, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলাগুলি মুসলমানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মালদহও এর সন্নিহিত (দেশগুলি) রাজশাহী, পূর্ণিয়া, রাজমহল ও এগুলির চারি-পার্শ্বস্থ এলাকা এবং মুর্শিদাবাদ মুসলমানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, এই স্থানগুলিতে যথাক্রমে বাংলার মুসলমান রাজন্যবর্গ ও নাযিমদের রাজধানী স্থাপিত হয়। ইতিহাসের রায় ও সাক্ষ্য থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আসামের মুসলমানেরা এদেশীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বংশধর নয়। যদিও দৈহিক গঠন, ভাষা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির দিক দিয়ে দেশীয় আসামীদের সংগে তাদের বহুল পরিমাণে মিল রয়েছে, তথাপি তারা আসামের মূল বাশিন্দা নয় (দ্রষ্টব্য : আসামের ইতিহাস—আওরংগজেবের কাছ থেকে শাহী ফরমান পেয়ে বাংলার সুবাদার মীরজুমলা যখন আসাম আক্রমণ ও জয় করেন তখন তাঁর এক অনুচর কর্তৃক লিখিত)।

তাদের এই সংখ্যা বৃদ্ধির যথাযথ কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও তাঁর মতামত যাই হোক না কেন, এর হিসেব দিতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন।

আমাদের খেদ এই যে সবচাইতে ন্যায়পরায়ণ ও জনপ্রিয় বৃটিশ সরকারের, যার তুলনা পৃথিবীর কোথাও নেই, শাসনকালে তাঁর

পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসের ৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, বাংলার রাজা হোসেন শাহ্, বিশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিক এবং অসংখ্য নৌকাসহ আসামের দিকে অভিযান করেন। আসামের রাজা তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে সে দেশের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে পলায়ন করেন। হোসেন শাহ্ সে দেশ শাসন করার জন্যে তাঁর অধিকাংশ সৈন্যসহ তদীয় পুত্রকে সেখানে রেখে আসেন। যখন বর্ষা ঋতু এলো এবং যাতায়াতের পথগুলি বন্যায় ভেসে গেলো ও বন্ধ হয়ে গেলো, তখন রাজা পর্বত থেকে অবতরণ করেন। তিনি তাঁর লোকজনের সহায়তায়, যারা বিজয়ী দলের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলো, যুবরাজকে তাঁর সর্দার ও অনুচরদেরসহ কারারুদ্ধ করেন। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা হয়ে থাকে যে, আসামের বর্তমান মুসলমানেরা হোসেন শাহের এই বন্দী সেনাবাহিনীর বংশধর। লেখক আরো বলছেন যে, এই বন্দীদের ও আসামের অধিবাসীদের মধ্যে সংঘটিত অসবর্ণ বিবাহের কারণে তাদের সন্তানগণ দেশীয় লোকদের রীতিনীতি ও চালচলন গ্রহণ করে এবং তারা কেবল নামে মাত্রই মুসলমান। তারা মুসলমানদের চাইতে দেশীয় লোকদের সহিত বেশী মিত্রভাবাপন্ন হতে পছন্দ করে এবং তারা ইসলামের অনুসারীদের চাইতে আসামীদের প্রতিই বেশী অনুরাগী। যে সমস্ত মুসলমান অন্য দেশ থেকে আসামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে, তাদেরকে নামাজ (উপাসনা) পড়তে ও রোজা (উপবাস) রাখতে দেয়া হতো, কিন্তু তাদের আযান দিতে কিংবা পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করতে দেয়া হতো না।

অনুগত মুসলমান প্রজাদের এহেন বিপুল সংখ্যা সম্পর্কিত মতগুলি সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে মুসলমানদেরকে উপহাস করার জন্যে অন্যায়রূপে তুলে ধরে তাদের মনে আঘাত হানার অবকাশ দেয়া হবে; তাছাড়া এই মুসলমানদের মনে আঘাত দেয় ও তাদের অনুভূতির ক্ষতি করে এমন ধরনের খামখেয়ালী ও নিন্দাসূচক উক্তিগুলি তাদেরকে লজ্জায় ফেলার জন্যে ও বিশ্বের চোখে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে সরকারী নথিপত্রে রক্ষিত হবে।

মিঃ বেভার্লির সর্বজনবিদিত রচনার মাধ্যমে আমাদের মুসলমান প্রজাদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার সংশোধনের জন্যে আমাদের পিতৃসম সরকারের নিকট বিনীতভাবে ও আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করছি। আমরা আন্তরিকতার সহিত এও কামনা করছি যে, ইতিহাস প্রদত্ত আলোকের সাহায্যে বিচার্য বিষয়টি অর্থাৎ আমাদের উৎপত্তি ও পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে যেন তদন্ত করা হয় এবং এই তদন্তের ফলাফল যেন সরকারী নথিপত্রে স্থান পায়।

দ্বি তী য়   অ ধ্যা য়

বাংলার প্রধান মুসলমান পরিবারগুলির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলার সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ মুসলমান পরিবারবর্গের অস্তিত্বের আরেকটি প্রমাণ হলো এই যে, ভারতবর্ষে ঘোরি, খিলজি, মোগল ও অন্যান্য মুসলমান রাজবংশের আধিপত্যকালে উচ্চপদস্থ ও দায়িত্বশীল কর্মচারী এবং খ্যাতিসম্পন্ন লোকদেরকে রাষ্ট্র কর্তৃক নগদ টাকায় বেতন ও বৃত্তিদানের পরিবর্তে জায়গির, তমঘা, আয়মা ও মদদি-ম'আশ দানের রীতি প্রচলিত ছিলো। সাধারণতঃ জায়গির ও তমঘা মঞ্জুর করা হতো বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীদেরকে এবং আয়মা ও মদদি-ম'আশ মঞ্জুর করা হতো শিক্ষিত ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোকদেরকে। জায়গির নামেমাত্র জীবৎকালের জন্যে মঞ্জুর করা হলেও সরকারী চাকরির অধিকাংশই মৃত জায়গিরধারী কর্মচারীর উত্তরাধিকারীদের ওপর অর্পিত হতো। ফলে, পরিবারের মধ্যে জায়গির বংশগত অধিকারে পরিণত হতো। আয়মা ও মদদি-ম'-আশ স্থায়ী ভিত্তিতে প্রধানতঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও পুণ্যবান লোকদেরকে মঞ্জুর করা হতো। এসমস্ত দান ছাড়াও পবিত্র স্থান, মশজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সরকার কর্তৃক নিষ্কর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে সময়ে যে সমস্ত নিষ্কর ভূমি দান করা হতো, সেগুলির ওপর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হতো এবং কঠোরতা পালন করা হতো। যেমন অতি প্রাচীন কাল থেকে রাজ্যের ভূসম্পত্তিতে কিয়ৎ পরিমাণে মালিকানা স্বত্ব ভোগ করার বিশেষ অধিকার রাজপরিবারের ছিলো এবং পূর্ববর্তী শাসকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত খরচপত্র ও প্রশাসনিক ব্যয়াদির জন্যে এ-সমস্ত ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতেন। এ কারণে রাজার মালিকানা স্বত্ব থেকে বিযুক্ত এ ধরনের ভূমিদান কেবলমাত্র ন্যায্য এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত কখনো কার্যকরী হতো না। ফলে, সরকার এ সমস্ত দান মহানগুণী ও সর্বজনবরেণ্য ধর্মীয় নেতার সুনিশ্চিত প্রয়োজনের বেলায় এবং মশজিদ ইত্যাদি পবিত্রস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মঞ্জুর করতেন। 'সুয়ুরগাল' [১] সম্পর্কে 'আইন-ই-আকবরি'-তে যে সমস্ত নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে প্রদত্ত হলো।

> দয়ালু সম্রাট (আকবর), আল্লাহ্ তাঁকে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন তার বলে চার শ্রেণীর লোকের জন্যে ভরণ-পোষণ ভাতার মঞ্জুরি সংরক্ষণ করতেন : সেগুলি হলো এই—
>
> [১] যে সমস্ত লোক আল্লার কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন ও যাবতীয় পার্থিব ব্যাপার থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়েছেন এবং সত্য জ্ঞানানুসন্ধানে দিবারাত্র নিয়োজিত আছেন।
>
> [২] যে সমস্ত লোক ধর্মের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন যাঁরা মানবিক প্রকৃতির পাপপূর্ণ প্রবণতাগুলিকে পরাভূত করে সমাজের দিক থেকে তাঁদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে।

---

১ দান হিসেবে প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি—অনুবাদক।

[৩] যে সমস্ত লোক সহায়-সম্পদহীন এবং নিজেদের জীবিকা-নির্বাহের জন্যে কোনো উপায় অবলম্বনে অসমর্থ।

[৪] যে সমস্ত সদ্‌গুণবিশিষ্ট ও সদ্বংশজাত লোক অপরিণাম-দর্শিতা ও অবিবেচনাবশতঃ কোনো পেশা শিক্ষালাভ করেননি বলে নিজেদেরকে ভরণপোষণে অসমর্থ।

নগদ টাকায় প্রদত্ত ভরণপোষণ ভাতাকে 'অযিফা' বলা হয় এবং ভূমি-দানকে বলা হয় 'মদদি-ম'আশ'। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই অসংখ্য লোকের মধ্যে এ দু' ধরনের দান বিতরণ করেছেন।

আফগানদের 'সুয়ুরগাল' খালসা কিংবা সরকারী ভূমি থেকে পৃথক ছিলো এবং এই মর্মে আদেশ জারি করা হয়েছিলো যে, যারা পাঁচশো বিঘা কিংবা তার অধিক ভূমির অধিকারী, স্বয়ং সম্রাট যে পর্যন্ত তাদের স্বত্বাধিকার পুনর্বিবেচনা ও অনুমোদন না করবেন সে পর্যন্ত তাঁরা সেই ভূমির ওপর তাদের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করবেন।

এ সম্পর্কে আরো একটি আদেশ প্রচার করা হয়েছিলো। আদেশটি ছিলো এই যে, একশত বিঘার অতিরিক্ত ভূমির সবটাই যদি 'ফরমান'-এ উল্লেখ না থাকে তাহলে তা দুই-পঞ্চমাংশে কমিয়ে আনতে হবে এবং বাকী তিন-পঞ্চমাংশ ভূমি ভূস্বামীদের অধিকার থেকে উদ্ধার করে তা সরকারী ভূমিতে রূপান্তরিত করা হবে। কেবলমাত্র ইরানী ও তুরানী বিধবাগণ এ প্রবিধান থেকে রেহাই পাবে।

আরো নিয়ম করা হয়েছিল যে, যে সমস্ত জায়গিরদার তাঁদের জন্যে নির্ধারিত জায়গির ছাড়াও আরো ভূমি দখল করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এ নতুন ভূমি থেকে এমন একটা অংশ মঞ্জুর করা যায়, যা তাঁর পরিত্যক্ত জায়গিরের তিন-চতুর্থাংশের সমান হয়।

আযাদ উদ্-দৌলার মন্ত্রিত্বের আমলে এই আদেশ প্রচারিত হয়েছিলো যে যদি কোন 'সুয়ুরগাল' একাধিক লোকের অধিকারে থাকতো এবং ফরমানের শর্তানুযায়ী বিভক্ত না হতো, তা'হলে কোনো এক অংশীদারের মৃত্যু হলে 'সদর' স্বেচ্ছাপূর্বক 'সুয়ুরগাল'কে ন্যায্যভাবে ভাগ করতেন এবং মৃত অংশীদারের অংশ তার ন্যায্য উত্তরাধিকারীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী ভূমির অধিকারে রাখতেন। অধিকন্তু 'সদর'-কে পনেরো বিঘা পর্যন্ত ভূমির স্বত্বদান মঞ্জুর করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিলো।

পুনশ্চ, যখন একশত বিঘা বা তার কম ভূমির অধিকারী অসাধুতার অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হতো তাহলে এই স্বত্বাধিকারীকে রাজার সম্মুখে উপস্থাপিত করার জন্যে 'সদর'-কে আদেশ দেয়া হতো। পরে এই মর্মে অতিরিক্ত আদেশ প্রচার করা হতো যে আবুল ফযলের সম্মতিক্রমে 'সদর' এই স্বত্বদানের পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করবেন।

সাধারণ নিয়ম ছিলো এই যে, অর্ধেক কর্ষিত ভূমি এবং বাকী অর্ধেক কর্ষণযোগ্য ভূমি সমন্বয়ে 'সুয়ুরগাল' গঠিত হতো। কিন্তু যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতো তাহলে সম্পূর্ণ 'সুয়ুরগাল'-এর এক চতুর্থাংশ হ্রাস করে বাকী অংশের পরিবর্তে নগদ টাকার একটি ভাতা দেয়া হতো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবিঘার রাজস্বের হার বিভিন্ন রকমের হতো কিন্তু কখনো এক টাকার কম হতো না।[১]

মূলতঃ এ ধরনের নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার অধীন, যা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে, বাংলার অধিকাংশ জেলার ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অধিকার-ভুক্ত লাখেরাজ কিংবা করমুক্ত রায়তিসত্বের প্রকারভেদ ও স্বরূপ পরপৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে।

---

১ আকবরের রাজত্বকালের 'সদর' সম্পর্কে টীকা

লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের প্রকারভেদ	স্বত্বাধিকারীর বিবরণ	রায়তি স্বত্বের প্রকৃতি
জায়গির	মুসলমান ও হিন্দু	কোনো দপ্তরের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কিংবা চাকরির পারিশ্রমিক বাবদ স্বত্বাধিকারীর জীবৎকালের জন্যে প্রদত্ত।
আল-তমঘা	ঐ	স্থায়ীভাবে মঞ্জুরীকৃত ভূমিদান
মদদি-ম'আশ	মুসলমান	কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, সৈয়দ ও উচ্চ বংশজাত মুসলমান-দেরকে প্রদত্ত।
আয়মা	ঐ	ধর্মীয় নেতা, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও সৈয়দদের জন্যে।
মসকান	ঐ	বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্যে।
নাযুরৎ	ঐ	আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, সৈয়দ এবং বয়োবৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ ধার্মিক লোকদের জন্যে।
খানকাহ্	ঐ	খানকাহ্ নির্মাণের জন্যে।
ফকিরান	ঐ	ভিক্ষাজীবীদের জন্যে।
নযরি দরগাহ্	ঐ	পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
নযরি ইমামাইন কিংবা তাযিয়া-দারি	ঐ	মুহরম উৎসব পালনের জন্যে।
যমিন-ই-মশজিদ	ঐ	মশজিদের চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্যে।

লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের প্রকারভেদ	স্বত্বাধিকারীর বিবরণ	রায়তি স্বত্বের প্রকৃতি
নযরি হযরত	মুসলমান	কোনো ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে।
খরচি মুসাফিরান	ঐ	পথিকদের আতিথেয়তার জন্যে।
মেরামতি মশজিদ ইত্যাদি	ঐ	মশজিদ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
মা-আ'ফি	ঐ	সদ্বংশজাত মুসলমানদের ভরণ-পোষণের জন্যে।
পিরান	ঐ	আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, শিক্ষিত লোক ইত্যাদির জন্যে।
খয়রাত কিংবা খয়রাতি	ঐ	নিঃস্ব অবস্থায় পতিত মুসলমান-দের জন্যে।
খারিজ জমা	হিন্দু ও মুসলমান	হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই এ রায়তি স্বত্বের অধিকারী
মিনহাই	ঐ	ঐ
ব্রাহ্মোত্তর	হিন্দু	বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের জন্যে।
মেহ্‌তেরান	ঐ	ব্রাহ্মণেতর হিন্দুদের জন্যে।
মালেক ও মালেকানা	মুসলমান ও হিন্দু	হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই এর অধিকারী।
দেবোত্তর	হিন্দু	হিন্দুদের পবিত্র স্থানের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে।
শিবোত্তর	ঐ	ঐ

লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের প্রকারভেদ	স্বত্বাধিকারীর বিবরণ	রায়তি স্বত্বের প্রকৃতি
সুরজ পর্বত	হিন্দু	হিন্দুদের পবিত্রস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
ইনাম	মুসলমান ও হিন্দু	হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাজের পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত।
মানকর	ঐ	ঐ

ওপরের বিবরণে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের রায়তি স্বত্ব ছাড়াও বাংলা দেশে আরো অনেক ধরনের লাখেরাজ রায়তি স্বত্ব আছে, যা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু এ সমস্ত নামের মধ্যে আল-তমঘা, আয়মা, মদদি-ম'আশ ও জায়গির এই চারটি রায়তিস্বত্ব রাজপ্রদত্ত দান বোঝায়।

আয়মা রায়তিস্বত্ব কেবল বাংলাদেশেই প্রচলিত এবং তা আর কোথাও দেখা যাবে না। এর থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এ দান কেবলমাত্র গৌড়ের রাজাদের দ্বারাই প্রদত্ত হতো।

'আয়মা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ জীবিকা বা ভরণপোষণ, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা রাজাদের প্রদত্ত জায়গির, বিশেষ করে অভাবগ্রস্ত ও বৃদ্ধ লোকদেরকে প্রদত্ত জায়গিরের অর্থই প্রকাশ করে। কেবলমাত্র সৈয়দ, ধার্মিক লোক, বয়োবৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ লোক ও মুসলমান ধর্মের নেতৃস্থানীয় লোকেরাই এ নামে পরিচিত দানের অধিকার ভোগ করতেন। কিংবা আরো মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, বাংলার রাজা মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদেরকে যে ভূমি দান করতেন তাকেই আয়মা নামে অভিহিত করা হতো। আবার আয়মাকে দুটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি হলো কর-মুক্ত এবং অপরটি হলো খুব সামান্য পরিমাণে নির্ধারিত করের

আওতাভুক্ত। যাহোক, এ উভয় শ্রেণীর দানই সরকারের তরফ থেকে দেয়া হতো। নিষ্কর আয়মার অতি সামান্য অংশেরই অস্তিত্ব এখন আছে ; কারণ মোগল রাজবংশের শাসনামলে এর অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করে তারপর পূর্ব স্বত্বাধিকারীদের সংগেই নিম্ন হারে করের বিনিময়ে পুনরায় বন্দোবস্ত করা হতো। গৌড়ের রাজাদের এবং মোগল সম্রাটদের প্রদত্ত লাখেরাজ কিংবা নিষ্কর রায়তিস্বত্বের মধ্যে পার্থক্য কেবল নামমাত্র ; গৌড়ের রাজারা খোদাভক্ত, শিক্ষিত ব্যক্তি ও ধর্মীয় উপদেষ্টাকে যে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করতেন তা আয়মা নামে অভিহিত হতো ; অপরপক্ষে মোগল সম্রাটদের প্রদত্ত এই একই দান অভিহিত হতো মদদি-ম'আশ নামে। আয়মা রায়তিস্বত্বের সন্ধান প্রধানতঃ সে সব জেলাতেই মিলবে, যেখানে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারবর্গ বাস করতেন। বাংলাদেশে এ ধরনের পঁচিশটি জেলা আছে। যথা :

১	মুর্শিদাবাদ	১০	বাঁকুড়া	১৮	ঢাকা
২	নদিয়া	১১	দিনাজপুর	১৯	ফরিদপুর
৩	২৪ পরগণা	২১	রাজশাহী	২০	বাখরগঞ্জ
৪	খুলনা	১৩	রংপুর	২১	ময়মনসিংহ
৫	যশোহর	১৪	বগুড়া	২২	চট্টগ্রাম
৬	বর্ধমান	১৫	পাবনা	২৩	নোয়াখালী
৭	হুগলী	১৬	দার্জিলিং	২৪	ত্রিপুরা
৮	মেদিনীপুর	১৭	জলপাইগুড়ি	২৫	মালদহ
৯	বীরভূম				

আবার, মুর্শিদাবাদ জেলায় আয়মার সংখ্যা হলো ৭০০ ; রাজশাহী, বাঘা ও নাটোরে বহুসংখ্যক আয়মা রয়েছে ; বগুড়াতে

এর সংখ্যা হলো ৬৯৪ ; বর্ধমানে ১৭০৫ ; হুগলীতে ৮৯৩ ; বাখরগঞ্জে আয়মার সংখ্যা কিছু পরিমাণে কম, কিন্তু যথাযথভাবে নিরূপণ করা হয়নি। মেদিনীপুরে এর সংখ্যা হলো ১২, ২৪-পরগণায় ১৬ এবং মালদহ, দিনাজপুরে, নোয়াখালিতেও কিছু সংখ্যক আয়মা আছে, কিন্তু সেগুলির ঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। ওপরের হিসাব থেকে একথা সুস্পষ্ট যে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, মালদহ, রাজশাহী এবং বগুড়া জেলায় অর্থাৎ গৌড়ের আশেপাশের জেলা-গুলিতে সর্বাধিক সংখ্যক আয়মা রয়েছে। কিন্তু তথাপি এসমস্ত জেলায় আয়মাগুলি প্রধানতঃ উচ্চ ও আদ্রর্তামুক্ত অংশে পড়েছে, যেখানে জমি শক্ত ও দৃঢ় ; কিন্তু জলাভূমিবিশিষ্ট কিংবা বালুকাময় কিংবা নদী প্লাবনের ভয় থাকতে পারে এ ধরনের এলাকায় তা নেই বললেই চলে। আবার, বাংলার তিনটি প্রাচীন উপরিভাগ, যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র ও বংগের মধ্যে রাঢ়েই বহুল পরিমাণে আয়মা দেখতে পাওয়া যাবে। বরেন্দ্রে আয়মার সংখ্যা রাঢ়ের চাইতে কম এবং বংগে কদাচিৎ দেখা যাবে।

সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর, রাজা তোডরমল যখন ভূমি-বন্দোবস্তের কাজ সমাপ্ত করেন, তখন সুয়ুরগালের ব্যবস্থাধীন অধিকাংশ আয়মা সরকারী ভূ-সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে নাযিম মুর্শিদকুলি খান ও নওয়াব কাশেম আলী খানের রাজত্বকালে আয়মা জমি পুনরায় সরকারের দখলে আসে এবং তারপর সেগুলি সামান্য করের বিনিময়ে আগের মালিকদের সংগে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। তখন থেকেই এই সামান্য কর-নির্ধারিত সম্পত্তিগুলি আয়মা নামে অভিহিত হতে থাকে। আয়মা ভূমির জন্যে সরকারী রাজটের সাধারণ হার ছিলো তিন বিঘার জন্যে এক টাকা।

স্যার ডব্লিউ. হাণ্টার তাঁর Statistical Account of Murshidabad গ্রন্থে লিখেছেন যে, কর-নির্ধারিত আয়মা ও লাখেরাজের মধ্যে পার্থক্য ছিলো খুবই সামান্য। আয়মা কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে দেয়া হতো; এবং যদিও তাদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো, তথাপি সেই রাজস্বের নির্দিষ্ট হার ছিলো খুবই কম এবং নামমাত্র। একই লেখক তাঁর রাজশাহীর বিবরণে লিখেছেন যে, এ জেলায় নাটোর ও বাঘায় আয়মা সম্পত্তি আছে। এসমস্ত আয়মা সম্পত্তি আগের শাসকদের কর্তৃক প্রধানত: মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত লোক ও তাদের ধর্মপ্রাণ পবিত্র ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও ধর্মীয় নেতাদেরকে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান-গুলিকে প্রদত্ত হতো। এ দানগুলি দেওয়ানি শাসনের বহুপূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে; এবং এ দানসূত্রে অধিকৃত মালিকানাস্বত্ব ছিলো বংশগত ও হস্তান্তরযোগ্য দুই-ই।

আয়মা ব্যতীত মদদি-ম'আশ ও অন্যান্য ধরনের যে সমস্ত লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের কথা পূর্বের বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে, তা বাংলা দেশে প্রচুর আছে এবং যদিও এ গুলির ঠিক পরিমাণ জানা নেই, তথাপি পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে এর পরিমাণ খুবই বেশী।

এই প্রদেশগুলিতে যখন বৃটিশ জাতির সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এই বৃটিশ সরকারের ১৭৯৩ খৃস্টাব্দের ১৯ সংখ্যক প্রবিধান অনুযায়ী দশ বিঘার অতিরিক্ত লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারীদের মধ্যে যারা রাজার 'সনদ' দাখিল করতে সমর্থ হয়নি তাদের রায়তি-স্বত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। এই প্রবিধান কার্যকরী করার ফলে অনেক খাঁটি দানই, সনদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বলে, সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

পরবর্তীকালে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩৭ সংখ্যক প্রবিধান পাস হয়। এ প্রবিধানের উদ্দেশ্য ছিলো রাজকীয় দান ব্যতীত আজীবন মেয়াদী ও অন্যান্য ধরনের লাখেরাজ রায়তি স্বত্ব সরকারী অধিকারে আনা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব থেকে আরম্ভ হয়েছে বলে অনুমিত হয় এমন ধরনের সম্পত্তির দখলকারী সনদের অধিকারী হলেও এবং উক্ত সনের আগেই তারা ন্যায্য উপায়ে এর অধিকার অর্জন করলেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত রাজস্বের চাইতে অধিক হারে যার রাজস্ব ইতিপূর্বে নির্ধারিত হয়নি এমন ধরনের ভূমি পুনরুদ্ধারও এ প্রবিধানের উদ্দেশ্য ছিলো।

সবশেষে, লাখেরাজ ভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রণীত ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২-সংখ্যক প্রবিধান এ সমস্ত রায়তি-স্বত্বের ওপর মরণ আঘাত হানে। এ প্রবিধানের ২৮ ধারায় একথা নির্দেশিত হয়েছে যে, খেতাবের জন্যে দিল্লীর সম্রাটের ফরমান, কিংবা কোনো উযির-নবাব বা রাজার কোনো সনদ অথবা পরোয়ানা বৈধ ভিত্তি বলে বিবেচিত হবে না, যে পর্যন্ত না অফিসের রেকর্ড থেকে এ ধরনের দলিলের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয় এবং জীবিত সাক্ষীদের দ্বারা এগুলির অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হয়; তাছাড়া অন্য প্রমাণ পত্রাদি লাখেরাজ সম্পত্তির পক্ষে থাকলেও কেবলমাত্র সে কারণেই তা বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না।

ওপরে উল্লিখিত প্রবিধানগুলির বিশেষ করে শেষোক্ত বিধানগুলির প্রয়োগের ফলে অধিকাংশ লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি সরকারী অধিকারের আওতায় আসে; এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই উচ্ছেদকারী আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থা সত্ত্বেও এই প্রদেশগুলিতে এখন পর্যন্ত এ ধরনের অসংখ্য মুসলমান লাখেরাজ রায়তি-স্বত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

কিন্তু যারা আমাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, এই অসংখ্য রায়তি-স্বত্বের সবই (এগুলির প্রকৃতির দ্বারাই যা কেবলমাত্র মুসলমানদের অধিকারভুক্ত বুঝায়) কি এদেশে অসংখ্য উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন নয়, যা তাদের অতীত বংশাবলীর অধিকারভুক্ত ছিলো? আমরা দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি যে, কেউ জোর করে আমাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে পারেন না। আমরা আরো প্রশ্ন করছি যে ঐ সমস্ত অসংখ্য পরিবারের ক্রম অগ্রসরমান গতিপথ কি লুপ্ত হয়ে গেছে? এবং যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের বংশধরগণ বাংলা দেশে না থেকে কোথায় আছে? আর তাঁরা যদি এ দেশের মুসলমানদের বংশধর না হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা কে? আমাদের আশঙ্কা হয় যে, ওপরের প্রশ্নাবলীর জন্যে প্রদত্ত যে কোনো স্পষ্ট জবাবই তাঁদের প্রচারিত মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, যাঁরা আমাদের মতের বিরোধিতা করে থাকেন।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ সমস্ত লাখেরাজ ও আয়মা রায়তিস্বত্ব ছিলো মুসলমানদের নিজস্ব। বর্তমানে সেই রায়তি-স্বত্বের সবগুলি তাদের অধিকারে নেই। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, একদিকে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলি ধ্বংসের কবলে পতিত হওয়ায় এবং অপরদিকে সরকারের নিলামনীতি সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করায় সরকার কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামের ফলে কিংবা স্বত্বাধি-কারীদের নিজেদের কর্তৃক বেসরকারীভাবে বিক্রয়ের ফলে এই রায়তিস্বত্বগুলি পূর্ব স্বত্বাধিকারীদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে; ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী লোকেরা মুসলমানদের ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করেছে।

একই ধরনের আরেকটি প্রমাণ হলো এই যে, এ দেশের অধিকাংশ পরগণা, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর মুসলমানী নামকরণ হয়েছে ; এভাবে একথা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করে যে সেগুলির জোতদার এবং মালিকগণ কোনো এক কালে মুসলমান ছিলো। আগের দিনে ভূসম্পত্তি ও 'ইলাকা'গুলি তাদের মালিকদের নামে অভিহিত হওয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো এবং সরকারী রেজিস্ট্রি বহিতেও গ্রামগুলি এ নামেই তালিকাভুক্ত হতো। উদাহরণস্বরূপ পরগণা-ই-বারবকাবাদ, পরগণা-ই-জাফরুজাল, পরগণা-ই-জওয়ার ইব্রাহিম, পরগণা-ই-বারবক, পরগণা-ই-সোলেমান শাহী, হাবেলি শেরপুর, আযমত শাহী পরগণা, হোসেল উজ্‌ল্ এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য নাম এ দেশের পরগণা ও গ্রামগুলি বহন করছে। এ ধরনের নামগুলি যথেষ্ট প্রমাণ করে যে এ সমস্ত সম্পত্তি প্রথমতঃ মুসলমানদের অধিকারে ছিলো এবং খিলজি ও ঘোরি বংশের আমিরদের নামের সংগে এই নামগুলির খুব বেশী সাদৃশ্য রয়েছে বলে এ ধারণা প্রবল যে এ সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিকগণ সে সময়ের আমির ও অভিজাত মুসলমান ছিলেন। এসমস্ত ভূস্বামী ও এলাকাদার তাঁদের সম্পত্তির ওপরই বসবাস করেছেন বলে স্পষ্টতঃই পল্লী এলাকায় উচ্চ মুসলমান পরিবারদের বসতি প্রাধান্য লাভ করেছে। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করাকেই অধিক পছন্দ করতেন, কেননা গ্রামবাসীরা শহরবাসীদের চাইতে কম বিপজ্জনক ও কম অমংগলজনক ছিলো, যে শহর-বাসীরা প্রচণ্ড আন্দোলন ও সরকার পরিবর্তনের প্রতি গ্রামবাসীদের চাইতে অধিক মনোযোগী ছিলো।[১] এ সমস্ত সম্মিলিত কারণের

১ বাংলায় আফগানদের সরকার রাজতন্ত্র জাতীয় ছিলো একথা বলা যায় না, বরং বলা চলে যে ইউরোপে গথ ও ভ্যানড্যালদের প্রবর্তিত

ফলেই উচ্চ ও নিম্ন বংশজাত মুসলমানগণ বর্তমানে এদেশের পল্লী অঞ্চলের লোকসংখ্যার এতো বড় একটা অংশ গঠন করেছে।

সামন্ত প্রথার সংগে এর অনেকটা সাদৃশ্য ছিলো বখতিয়ার খিলজি ও পরবর্তী বিজেতাগণ একটি নির্দিষ্ট জেলাকে তাঁদের নিজেদের ভূসম্পত্তি হিসেবে পছন্দ করতেন; অন্যান্য জেলা অধস্তন সর্দারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো; সর্দারগণ আবার তাঁদের ক্ষুদ্র সেনানায়কদের মধ্যে এই ভূসম্পত্তিগুলি পুনর্বিভাগ করে দিতেন। এই সেনানায়কদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ভরণপোষণ করতেন যে সেনাদল প্রধানতঃ তাঁদের আত্মীয় ও আশ্রিত লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হতো। যাহোক, এই লোকগুলি নিজেরা ভূমি চাষ করতেন না, কিন্তু প্রতিটি কর্মচারী একটি ক্ষুদ্র ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং তাঁর অধীনে ছিলো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক হিন্দু রায়ত; নিজের স্বার্থেই যাদের সংগে তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও সংযমের সহিত আচরণ করতেন। যদি ঘন ঘন প্রভুর পরিবর্তন না ঘটতো এবং অনবরত বিদ্রোহ ও আক্রমণের দৃশ্য দেখা না যেতো, তাহলে ভূমির কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত সুখী অবস্থায় কালাতিপাত করতে পারতো; কিন্তু উক্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি খুব কমই মনোযোগ দেয়া সম্ভব হতো; এবং ভারতের অন্য অংশে সেখানকার দেশীয় লোকদের অর্থাৎ রোহিলাদের নিজস্ব সরকারাধীনে পরবর্তীকালে চাষের যেরূপ উন্নতি হয়েছিলো বাংলার কৃষিরও তদ্রূপ উন্নতি হতো।

সন্দেহ নেই যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো; কিন্তু ইহাও সম্ভাব্য মত যে ব্যবসায়ের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে কিংবা গৃহ ত্যাগ করে দলপতির সংগে যোগদানের জন্যে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রিত হয়ে আফগান কর্মচারীদের অনেকেই ধনী হিন্দুদের নিকট তাঁদের ভূসম্পত্তি ইজারা দিতেন, যাদেরকে শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধাদি লাভের অনুমতি দেয়া হতো।

বৃত্তি হিসাবে প্রদত্ত হাজার বিঘা লাখেরাজ ভূমিসহ সমাধি-স্তম্ভ, গোরস্তান, ফকির-দরবেশের আস্তানা, পবিত্র স্থান ও মশজিদের চিহ্ন এখন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি গ্রাম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে দৃষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে সামান্য অংশমাত্র এর যথার্থ উত্তরাধিকারিত্বের প্রমাণের উদ্দেশ্যে আজও টিকে আছে এবং যেখানে এগুলি টিকে আছে যেখানে যে সুদূর অতীতে বিখ্যাত ও দরবেশতুল্য মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিলো ওপরের কথাটি তারই নির্দেশ দেয়।

টীকা *

মুসলমান শাসকদের আমলে বাংলার ভূমি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো: তাদের একটা ছিলো 'সরকারী ভূমি', যার রাজস্ব সরকারী বিধি ব্যবস্থায় আদায় করা হতো এবং যা 'খলসা ভূমি' নামে অভিহিত হতো। আরেক ধরনের জমির মালিক ছিলেন আমির ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, যা ছিলো তাঁদের জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত। সম্রাট আকবরের সময়ে 'খলসা ভূমি' থেকে উৎপন্ন আয়ের পরিমাণ ছিলো ৬৩০৩৭৫২৲ টাকা এবং 'জায়গির' থেকে উৎপন্ন আয়ের পরিমাণ ছিলো ৪৩ লক্ষ টাকা (দ্রষ্টব্য: Parliamentary V. Report)।

খলসা ভূমি—এই ভূমির রাজস্বের বিধিব্যবস্থার জন্যে সরকার 'আওয়ামিল' নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের অধীনে যে সমস্ত লোক রাজস্ব আদায় ও সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হতেন তাঁদেরকে বলা হতো জমিদার। এই পরবর্তী কর্মচারিগণ রায়তদের নিকট থেকে

* দ্রষ্টব্য: আইন-ই-আকবরি।

রাজস্ব আদায় করে তা পরে রাজ-কোষাগারে প্রেরণ করতেন; এ কাজের জন্যে তাঁদেরকে একটা নির্দিষ্ট হারে কমিশন দেয়া হতো। বাংলা দেশে এই জমিদারদের অনেকেই ছিলেন কায়স্থ গোত্রের হিন্দু। প্রকৃতপক্ষে ভূমির ওপর জমিদারদের কোনো অধিকার ছিলো না; পক্ষান্তরে তাঁরা ছিলেন অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর মতোই। কিন্তু তখনকার অধিকাংশ সরকারী পদই বংশগত ছিলো বলে এ পদে পিতার পর পুত্রের নিয়োগ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হতো। কিন্তু বস্তুতঃ জমিদারদের বরখাস্ত ও নিয়োগ ছিলো সম্পূর্ণভাবে তখনকার সার্বভৌম শাসকের ক্ষমতাধীন। কোনো জমিদার কোনো ত্রুটি বা অপরাধের জন্যে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের নিয়োগ বাতিল করা এবং তা পূর্ণ করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো সরকারের মর্জির ওপর। সে সময়ে রাজস্ব আদায়, আদায়কৃত রাজস্ব সরকারী তহবিলে প্রেরণ, তার যথাযথ হিসাব দাখিল এবং এ ধরনের কাজের মতো গুরুদায়িত্ব জমিদারের ওপর ন্যস্ত হতো। রাজস্ব আদায় ও তা সরকারী তহবিলে প্রেরণের কাজে কোনো দোষত্রুটি ধরা পড়লে জমিদারকে কঠোর শাস্তি পেতে হতো এবং সে কারণে তাঁদেরকে নানা ধরনের কষ্ট ভোগ করতে হতো। তাছাড়া এ ধরনের অপরাধীদের জন্যে অন্যান্য শাস্তির মধ্যে কারাদণ্ড, এমন কি শারীরিক নির্যাতনেরও বিধান ছিলো। অধিকন্তু জমিদারকে তাঁদের কর্তৃত্বাধীন এলাকার মধ্যে অনুষ্ঠিত চুরি, ডাকাতি, খুন এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধের জন্যে জবাবদিহি করতে হতো।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কায়স্থ গোত্রের লোকদেরকে জমিদার হিসেবে নিয়োগ করার একটি কারণ এই যে, কৃষি ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অন্যান্য লোকের চাইতে অধিক ছিলো।

আরেকটি কারণ এই যে, তখন জমিদারের পদ গ্রহণের সময় যে সমস্ত কঠোরতা সরকারের দাবীর সংগে থাকতো এবং জমিদারদের স্কন্ধে তখন যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হতো সেগুলি ঐ পদগ্রহণকারী কায়স্থের চাইতে উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের জন্যে ছিলো বিঘ্নস্বরূপ, যাঁরা সেই পদের সংগে সংস্পৃষ্ট সমস্ত দায়িত্ব থেকে তাঁদের নিজেদেরকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে, এ পেশার সংগে এতো বেশী সন্ত্রাস জড়িয়ে থাকতো যে বৃটিশ সরকারের শাসনামলের প্রারম্ভে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হওয়ার পরেও সাবধানী লোকেরা প্রথম প্রথম জমিদারি গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করতেন। যদি তাঁরা লাভের খাতিরে জমিদারি গ্রহণের জন্যে প্রলুব্ধ হতেন, তাহলে তাঁরা তা ছদ্মনামে গ্রহণ করতেন। এমতাবস্থায় এদেশে জমিদারি পেশা মুসলমান শাসকদের আমলে প্রায় কায়স্থ গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং উল্লিখিত রীতি সমগ্র মুসলিম যুগব্যাপী কমবেশী প্রচলিত ছিলো।

যখন বৃটিশ শাসন শুরু হয়, তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের স্থায়ী বংশগত অধিকার কায়েম করে। তখন থেকে জমিদারগণ ভূমিতে তাঁদের মালিকানাস্বত্ব লাভ করতে থাকেন। বৃটিশ সরকারের অধীনে ভূমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের হার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় তার ফলস্বরূপ জমিদারদের অবস্থাও অধিকতর উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে লাগলো।

অপরশ্রেণীর ভূমি বা জায়গির ভূমি—এই শিরোনামায় আমি মসনবি ও অ-মসনবি জায়গির, আয়মা, মদদি-ম'আশ এবং অন্যান্য ধরনের সমস্ত নিষ্কর ভূমি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এসমস্ত

ভূমি দেশের অভিজাত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিলো। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মনসবদারগণ, প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান কিংবা সম্ভ্রান্ত বংশজাত লোক এবং আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ জায়গির, আয়মা ও মদদি-ম'-আশের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হিসেবে সম্মানিত হতেন। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত খরচ এবং তাঁদের চাকরির জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খরচাদি তাঁদের নিজ নিজ ভূসম্পত্তির রাজস্ব থেকে নির্বাহ করা হতো। তাঁদের নিকট দাবী করা হলে তাঁরা তাঁদের রাজা ও দেশের জন্যে কাজ করতেন। প্রতিটি মনসবদার তাঁর জায়গিরের সম্পদের অনুপাতে একটি মিলিশিয়া বাহিনীর ভরণ-পোষণ করতেন এবং এই বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের সময় তিনি সরকারকে সাহায্য করতেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের সুবিধার জন্যে নিজ নিজ ভূসম্পত্তি শাসন করতেন; কিন্তু তাঁরাও তাদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তির রাজস্ব সংগ্রহের কাজের দায়িত্ব কায়স্থ গোত্রের লোকদের ওপর অর্পণ করতেন, যাঁরা এই অর্থেও জমিদার খেতাবে অভিহিত হতেন। তাহলে জমিদার শব্দটি এমন একজন লোককে বুঝাতো, যিনি কমিশন লাভের বিনিময়ে ভূস্বামীর পক্ষ হয়ে ভূমির রাজস্ব আদায় করতেন এবং ঐ রাজস্ব তাঁর নিকট জমা দিতেন।

পদমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোকদের অধিকৃত জায়গির দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো: এদের একটি ছিলো বংশগত ও স্থায়ী এবং অপরটি বংশগত ও স্থায়ী ছিলো না, তা ছিলো অস্থায়ী। প্রথমোক্ত শ্রেণীর জায়গিরের অধিকারী ছিলেন প্রসিদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ যাঁরা জনসাধারণের ধর্মীয় নেতা ও সদ্বংশজাত লোক হিসেবে সম্মান পেয়ে থাকেন। এসমস্ত জায়গিরদারকে তাঁদের সম্পত্তি থেকে অধিকারচ্যুত করার ক্ষমতা রাজার ছিলো না;

পক্ষান্তরে রাজা সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণ করতেন।

যথার্থভাবে বলতে গেলে যদিও সরকারী কর্মচারী ও মনসবদার-দের জায়গির অস্থায়ীভিত্তিক ছিলো, তথাপি সে সময়ে অধিকাংশ নিয়োগই বংশগত ছিলো বলে এবং তা একই পরিবারে থেকে যেতো বলে স্বাভাবিকভাবেই সে সমস্ত জায়গির কিয়ৎ পরিমাণে বংশগত বলেই বিবেচিত হতো। কোনো পরিবারে এহেন জায়গিরের বংশগত ভোগাধিকারের ধারাবাহিকতা তখনই লোপ পেতো, যখন পদাধিকারী ব্যক্তি তাঁর অফিস কর্তৃক সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতেন। এধরনের ব্যাপার ঘটলে এভাবে পুনরুদ্ধারকৃত জায়গির একই নিয়মে তাঁকেই দেয়া হতো, যিনি এ শূন্যপদে নিযুক্ত হতেন। বাংলা দেশ দীর্ঘকাল যাবৎ স্বাধীন শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে বলে জায়গির থেকে এ ধরনের উচ্ছেদ এবং এর বিলি-ব্যবস্থা খুব কমই সংঘটিত হতো। কেবলমাত্র শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে এবং এক রাজবংশ থেকে অপর রাজবংশে শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত হলে এর ব্যতিক্রম দেখা দিতো। কিন্তু যখন এদেশ কোনো বিদেশী শক্তির পদানত হতো, তখন অবশ্য আগের শাসন-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতো। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বাংলা দেশ যখন তার আযাদি হারালো এবং মোগল সম্রাটদের শাসনাধীনে এলো, তখন এদেশের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির অধিকার থেকে মসনবি জায়গির চলে গেলো এবং বিদেশী মোগল আমিরদের অধিকারে এলো। কিন্তু তথাপি তখন উচ্চ-বংশজাত লোক ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সংযত ও কোমলতা প্রদর্শিত হয়েছিলো ; কেননা তাঁদের জায়গিরের কিয়দংশ তাঁদের অধিকারে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, কিংবা সম্পূর্ণ

জায়গির সরকার অধিকার করে তার বদলে তাঁদেরকে নতুন দান বরাদ্দ করেছিলেন। অধিকন্তু মোগল সম্রাটগণ সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক লোকদেরকে অসংখ্য মদদ-ই-ম'আশ (এক প্রকার নিষ্কর সম্পত্তির রায়তিস্বত্ব) দান করেছেন; কিন্তু মোগলদের শাসনামলে জায়গিরের পুনরুদ্ধার ও দান এবং বৃদ্ধি ও অদল-বদল সর্বদাই চলতো।

পরবর্তীকালে এদেশ যখন বৃটিশ শাসনের অধীনে এলো, তখন পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত কর্মচারী ও মনসবদার তাঁদের চাকরি হারালেন এবং তৎকালীন শাসন কর্তৃপক্ষ সমস্ত মসনবি ও অ-মসনবি জায়গির পুনরুদ্ধার করে নিলেন; কিছু কিছু অধিকারচ্যুত জায়গিরের পরিবর্তে বৃত্তি দেয়া হলো; পদচ্যুত কর্মচারী ও মনসব-দারদের পরিবর্তে নগদ টাকায় পরিশোধ্য বেতনে ইউরোপীয় কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু সে সময়েও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সম্ভ্রান্ত ও ধর্মীয় লোকদের জায়গির যেমন ছিলো তেমনি থাকার অনুমতি দান করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে আইন ও নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন। তা সত্ত্বেও আইনের কঠোরতার জন্যে এবং অন্যান্য কারণে পরিশেষে অসংখ্য লাখেরাজ জমির রায়তি-স্বত্ব এবং ভূসম্পত্তি সরকার পুনরুদ্ধার করেন।

যে সমস্ত মসনবি ও অন্যান্য ধরনের জায়গির সময় সময় সরকার পুনরুদ্ধার করতেন, খলসা ভূমির মতো একই নিয়মে রাজস্বের বিনিময়ে জমিদারদের সংগে সেগুলির বন্দোবস্ত হতো। পরিণামে ভূমির আসল মালিকগণ, যাঁরা বিনা করে ভূমির অধিকার ভোগ করতেন এবং যাঁরা ছিলেন দেশের সেরা ব্যক্তি, এখন সম্পূর্ণ-রূপে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাঁদের পরিবর্তে সরকারী রাজস্ব এজেন্ট কিংবা জমিদারগণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র বদৌলতে জমির স্বত্বাধিকার লাভ করেন। এ আমূল পরিবর্তন বৃটিশ শাসনের

প্রারম্ভেই সাধিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সরকারই জমিদারগণকে ভূস্বামীতে পরিবর্তিত করেন; কেননা এখন তাঁরা যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, আগে তাঁদের তেমন মর্যাদা ছিলো না। তখন মনসবদার ও অন্যান্য জায়গিরদারই ছিলেন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

মিঃ জন গ্র্যাণ্ট লিখেছেন যে বাংলার দুই-পঞ্চমাংশ ভূমির অধিকারী ছিলেন আমির ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং অবশিষ্ট তিন-পঞ্চমাংশের মালিক ছিলেন শাসনরত রাজা। এর থেকেই একথা ধারণা করা যায় যে, কত বিপুল সংখ্যক মর্যাদাসম্পন্ন লোক, জায়গিরদার ও মনসবদার এদেশে বাস করতেন। যদিও এই জায়গিরদারগণ অদৃশ্য হয়েছেন, তাঁদের পদ লোপ পেয়েছে এবং তাঁদের জায়গির সরকারের হাতে চলে গেছে, তথাপি তাঁদের পদচিহ্নের অস্তিত্ব অদ্যাবধি রয়ে গেছে এবং তাঁদের বংশধরগণ এখনো এদেশে আমাদের মধ্যেই বাস করছেন।

আমাদের মনে হয়, আমরা যদি মনসবের প্রকৃতির সংগে সম্পর্কযুক্ত কোনো কিছু এবং এ ধরনের পদাধিকারীদের কথা এখানে উল্লেখ করি, যার থেকে বোঝা যাবে যে এ রাজ্যে কত সংখ্যক অভিজাত মুসলমান ছিলেন এবং এই উচ্চপদস্থ অভিজাত ব্যক্তিগণ কি ধরনের ছিলেন তাহলে তা আমাদের পাঠকবর্গের নিকট অহিতকর হবে না। আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে 'আইন-ই-আকবরি'র বিধি এবং এতৎসঙ্গে তার ওপরে প্রদত্ত ডঃ ব্লকম্যানের মূল্যবান টীকার উল্লেখ করছি।

অধ্যাপক ব্লকম্যানকৃত আকবরের রাজত্বের 'সদর' সম্পর্কে টীকা :

এই 'আইন'-এ—যা সমগ্র কর্মের মধ্যে একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক ব্যাপার—চাঘ্‌তাই শব্দ 'সুয়ুরগাল'-এর অনুবাদ

আরবীতে করা হয়েছে 'মদদ-উল-ম'আশ', ফার্সীতে করা হয়েছে 'মদদ-ই-ম'আশ', যার জন্যে আমরা পাণ্ডুলিপিতে প্রায়ই 'মদদ-ও-ম'আশ দেখতে পাই। শেষোক্ত পদটির অর্থ বোঝায় 'জীবিকা-নির্বাহের সাহায্য' এবং এর সমতুল্য (মিল্ক) কিংবা সম্পত্তি, ইহা আবুল ফযল বর্ণিত হিতকর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূমিকে নির্দেশ করে। এ ধরনের ভূমি ছিলো বংশগত এবং এ কারণেই ইহা জায়গির কিংবা 'তুযুল' থেকে আলাদা, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মনসবদারগণকে বেতনের পরিবর্তে দান করা হতো।

এ আইন প্রমাণ করে যে আকবর স্বেচ্ছাচারিতার সহিত খুব বেশী করে সুয়ুরগাল্ ভূমির বিরোধিতা করেছেন। যে ভূমি তাঁর পছন্দ হয়েছে তাই তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং বহু মুসলমান (আফগান) পরিবার ধ্বংস করে তাঁর রাজ্য কিংবা খলসা ভূমির পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। তিনি সদরের ক্ষমতাও সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে দেন, যাঁর সম্মান বিশেষকরে মোগল রাজবংশের ক্ষমতা-লাভের পূর্বে অত্যধিক ছিলো। এই সদরের কিংবা সাধারণভাবে অভিহিত সদর-ই-জাহানের নির্দেশই জুলুস অথবা কোনো নতুন রাজার সিংহাসনারোহণকে অনুমোদন করতো। আকবরের রাজত্ব-কালেও তিনি পদমর্যাদার দিক থেকে সাম্রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ স্থানের অধিকারী ছিলেন দ্রষ্টব্য : ৩০ নং আইনের শেষাংশ)। এই সদরের ক্ষমতাও ছিলো প্রচুর। তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ আইন-কর্মচারী এবং তাঁদের ক্ষমতা ছিলো আমাদের মধ্যে প্রধান-প্রশাসকদের সমতুল্য। ধর্ম ও পরোপকারের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত জমি উৎসর্গ করা হতো, তাঁরা সেগুলির তত্ত্বাবধান করতেন এবং রাজার এ ধরনের ভূমি স্বাধীনভাবে দান করার মতো অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারীও তাঁরা ছিলেন। তাছাড়া তাঁরা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ আইন-

কর্মচারী এবং ধর্মসংক্রান্ত বিচারালয়ের উচ্চ বিচারকের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন। এই ক্ষমতার বলে আবদুল নবি, সদরের পদে বহাল থাকাকালে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে দু'জন লোকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য : পৃঃ ১৭৭)।

মোগলদের আগের যুগে 'ইদ্‌রারাত', 'বযায়েফ', 'মিল্ক', 'ইনাম-ই-দেহা', 'ইনাম-ই যমিনহা' ইত্যাদি কথাগুলি 'সুয়ুরগাল' (কিংবা কোনো কোনো অভিধানের বানান অনুযায়ী 'সেয়ুরগাল' বা 'সুঘারগাল') শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে দেখা যেতো।

আগের রাজাদের মধ্যে আলাউদ্দীন খিলজি কুখ্যাত ছিলেন এজন্যে যে তিনি অবজ্ঞাভরে পূর্ববর্তী শাসকদের দান বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি 'মদদ-ই-ম'আশ' রায়তিস্বত্বের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করে সেগুলিকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করেন। তিনি এই উচ্চপদে তাঁর চাবি-বহনকারীদেরকে নিযুক্ত করে সদরের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ করেছিলেন (তারিখ-ই-ফিরিশতাহ্, পৃঃ ৩৫১)। যাহোক, কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ্ তাঁর বারো বছর চার মাস কালের শাসনামলে আলাউদ্দীন কর্তৃক পদচ্যুত কর্মচারীদের অনেককে তাঁদের পূর্বপদে পুনরায় বহাল করেছিলেন (তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃঃ ৩৫৮)।

শেরশাহ্ ভূমিদান করে যে উদারতা দেখিয়েছেন তজ্জন্য তিনি মোগল ঐতিহাসিকদের হাতে প্রায়ই অভিযুক্ত হয়েছেন, একথা ওপরে (অর্থাৎ তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ২৫৬-এর টীকায়) উল্লিখিত হয়েছে। সম্রাট আকবর কেন যে তাঁর সময়কার দান-ভোগকারীদের প্রতি এ ধরনের অপ্রত্যাশিত নির্মমতা দেখিয়েছেন, এটাও তার একটা কারণ হতে পারে।

প্রতিটি 'কুলাহ্'-তে একজন সদর-ই-জায কিংবা প্রাদেশিক সদর ছিলেন, যাঁরা প্রধান সদরের (সদর-ই-জাহান বা সদর-ই-কুল বা সদর-ই-সুদুর) আদেশাধীনে কাজ করতেন।

অন্যান্য দপ্তরের মতো 'সদর'দের দপ্তরেও ব্যাপকভাবে ঘুষ গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত ছিলো। একজন স্বত্বাধিকারীর ফরমানে যে পরিমাণ ভূমির উল্লেখ থাকতো তার সংগে উক্ত স্বত্বাধিকারীর অধিকৃত প্রকৃত ভূমির পরিমাণের পার্থক্য ছিলো বিস্তর। অথবা ফরমানের ভাষা এমন দ্ব্যর্থকভাবে লেখা হতো যে স্বত্বাধিকারী ইচ্ছা করলে আরো বেশী ভূমির অধিকার ভোগ করতে পারতেন এবং তিনি যতদিন পর্যন্ত কাযি এবং প্রাদেশিক সদরকে ঘুষ দিতেন ততদিন পর্যন্ত সেই অতিরিক্ত ভূমি তাঁর অধিকারে রাখতে পারতেন। এ কারণেই পুনঃ পুনঃ তদন্তের পর সম্রাট আকবর যে পূর্ববর্তী শাসকদের প্রদত্ত দানগুলি বাতিল করেছেন তা ছিলো যুক্তিসংগত। সম্রাটের ধর্মীয় মতবাদ (দ্রষ্টব্য : তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃঃ ১৬৭) এবং উলেমাদের প্রতি তাঁর পোষিত ঘৃণা থেকেই, যাদের অনেকেই নিষ্কর ভূমির অধিকারী ছিলেন, তিনি তাঁদের দান হিসেবে ভোগকৃত ভূমিগুলি পুনরুদ্ধার করার পক্ষে ব্যক্তিগত এবং সে কারণে অধিকতর জোরালো যুক্তি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি তাঁদেরকে ভূমিহীন করে সিন্ধুর ভক্করে কিংবা বাংলা দেশে তাড়িয়ে দেন, যে দেশের জলবায়ু সে সময়ে পরবর্তীকালের মতোই খারাপ ছিলো। যে লোককে আকবর স্বহস্তে তাঁর চটিজুতো সুবিন্যস্ত করে দিয়ে সম্মান দেখাতেন, সেই আবদুল নবির পতনের পর সুলতান খাজা নামক একজন খোদাভক্ত ধার্মিক প্রবরকে (দ্রষ্টব্য ; তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃ: ১০৪) সদর হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ; এবং তাঁর পরে সদরগণের স্বাধীনভাবে সম্রাট

আকবরের ভূমি দান করার ক্ষমতা এতো বেশী সীমিত করা হয় এবং তাঁদের লক্ষ্য রাখার মতো দানের পরিমাণ এতো কমে যায় যে, তা বদায়ুনিকে ব্যংগাত্মক মন্তব্য করতে প্রবৃত্ত করে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আকবরের সদর ছিলেন—

১। শেখ গদাই—একজন শিয়া, বৈরামখানের সুপারিশে নিযুক্ত, ৯৮৮ হিজরি পর্যন্ত।

২। খাজা মুহম্মদ কলিশ--৯৭১ হিজরি পর্যন্ত।

৩। শেখ আবদুল নবি—৯৮৬ হিজরি পর্যন্ত।

৪। সুলতান খাজা—৯৯৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

৫। শিরাজের আমির ফতেহ্ আল্লাহ্—৯৯৭ হিজরি পর্যন্ত।

৬। সদর জাহান—যাঁর নাম তাঁর পদের অনুরূপ ছিলো।

আবুল ফযল মৌলানা আবদুল বাকি নামে একজন সদরেরও উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু আমি জানি না তিনি কখন এই পদে বহাল ছিলেন।

আমি বদায়ুনি থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করছি—

পৃষ্ঠা ২৯। শেখ গদাই মদদ-ই-ম'আশ ভূমি বাতিল করে দেন এবং খান যাদাদের (আফগানদের) উইল-করা সম্পত্তি কেড়ে নেন। যে ব্যক্তি অবমাননাকর আচরণ সহ্য করতে পারতো কেবল তাকেই 'সুয়ুরগাল' দান করা হতো, অন্যকে নয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান কালের সংগে তুলনা করলে যখন মাটির প্রতিটি জরিবের, কেবল জরিবই নয়, তার চাইতেও ন্যূন অংশের অধিকারে বাধা উত্থাপিত হয়, তখন আপনি শেখকে আ'লম বক্স (যিনি একটি পৃথিবী বিতরণ করেন) বলতে পারেন।

পৃষ্ঠা ৫২। শেখ গদাইয়ের পর খাজা মুহম্মদ কলিশ ৯৬৮ হিজরিতে সদর নিযুক্ত হন ; কিন্তু তিনি এমন ব্যাপক ক্ষমতার

অধিকারী ছিলেন না যাতে তিনি মদদ-ই-ম'আশ হিসেবে জমি দান করতে পারেন ; কারণ তিনি ছিলেন দেওয়ানদের অধীনস্থ ব্যক্তি।

পৃষ্ঠা ৭১। ৯৭২ হিজরিতে কিংবা হয়তো আরো সঠিকভাবে বলা চলে যে ৯৭১ হিজরিতে শেখ আবদুল নবি সদর নিযুক্ত হন। জমি বিতরণের ব্যাপারে তাঁকে তখনকার উযির ও উকিল মুযাফ্‌ফর খানের সংগে পরামর্শ করতে হতো। কিন্তু শীঘ্রই তিনি যোগ্য লোকদেরকে জীবিকা-ভাতা, ভূমি এবং পেন্সনের সবটাই দান করার মতো চূড়ান্ত ক্ষমতা এতো বেশী পরিমাণে লাভ করলেন যে, যদি আপনি হিন্দুস্তানের পূর্ববর্তী সমস্ত রাজার দান দাঁড়ি-পাল্লার এক দিকে এবং শেখের দানগুলি অপর দিকে রাখেন তাহলে শেখের পাল্লার ওজনই বেশী হবে। কিন্তু কয়েক বছর পরেই পূর্ববর্তী রাজাদের যেরূপ ছিলো, শেখের পাল্লাও তদ্রূপ ওপরে উঠে গেলো এবং ব্যাপার উল্টো দিকে মোড় নিলো।

পৃষ্ঠা ২০৪। ৯৮৩ হিজরিতে মহামান্য সম্রাট এই মর্মে আদেশ দেন যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের আয়মা সম্পত্তিগুলি প্রতিটি পরগণাস্থ ক্রোড়িদের দ্বারা ইজারা দেয়া হবে না, যে পর্যন্ত না তাঁরা পরীক্ষা ও সত্য প্রতিপাদনের জন্যে সদরের নিকট তাঁদের ফরমান উপস্থাপিত করে, যাতে তাঁদের দান, জীবিকা-ভাতা ও পেন্সনের কথা বর্ণিত আছে। একারণে পূর্ব দেশীয় জেলাগুলি থেকে সিন্ধুস্থ ভক্কর পর্যন্ত এলাকার বিপুল সংখ্যক যোগ্য লোক দরবারে আগমন করেন। যদি তাঁদের কেউ কোনো আমিরকে কিংবা সম্রাটের কোনো নিকট বন্ধুকে তাঁর শক্তিশালী রক্ষক হিসেবে পেতেন, তাহলে তিনি তাঁর ব্যাপারের ফয়সালা করার ব্যবস্থা করতে পারতেন ; কিন্তু যাঁরা এ-ধরনের সুপারিশ লাভে বঞ্চিত হতেন তাঁরা শেখের প্রধান কর্মচারী সৈয়দ আবদুর রসুলকে খুব

দিতে বাধ্য হতেন কিংবা তাঁর ফরাস, দ্বারোয়ান, সহিস এবং মেথরদের মাধ্যমে তাঁর করুণা লাভের জন্যে তাদেরকে উপহার দিতেন। যাহোক, তাঁরা জোরালো সুপারিশ লাভে বঞ্চিত হলে কিংবা ঘুষের আশ্রয় নিতে না পারলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতেন। অনেক আয়মাদার তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে আবেদনকারীদের ভিড়ের চাপে মৃত্যুবরণ করেছেন। যদিও এই ঘটনার একটি রিপোর্ট সম্রাটের কর্ণগোচর হয়েছিলো, তথাপি এই ভাগ্যহত লোকদেরকে সম্রাটের সম্মুখে নিয়ে যেতে কেউ সাহস করেনি। শেখ যখন তাঁর সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের সংগে তার মসনদে (গদিতে) বসেন এবং প্রতিপত্তিশালী আমিরগণ বৈজ্ঞানিক অথবা ধার্মিক লোকদেরকে তাঁর দপ্তরে এনে তাঁর নিকট উপস্থাপিত করেন, তখন শেখ তাঁদেরকে ন্যক্কারজনকভাবে গ্রহণ করেন, তিনি তাঁদেরকে কোনো সম্মান দেখাননি। বহু জিজ্ঞাসাবাদ, অনুনয়বিনয় ও অতিশয়োক্তির পর তিনি উদাহরণ স্বরূপ 'হিদায়াহ' (আইন সম্পর্কিত একটি পুস্তক) ও অন্যান্য কলেজ পুস্তকের একজন শিক্ষককে প্রায় এক শ' বিঘা জমি দান করেন; এবং এ ধরনের লোক বহুদিন ধরে এর চাইতে অধিক জমির অধিকারী হলেও শেখ সে জমি কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খ্যাতিহীন কিংবা নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে এমনকি হিন্দুদেরকেও ব্যক্তিগত অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। তখন থেকেই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদেরকে গণনার আওতায় আনা হয়েছিলো।

... .

আবদুল নবির পরিণতি ওপরে বর্ণিত হয়েছে। সম্রাট আকবর মক্কার দরিদ্রদের সাহায্যার্থে তাঁকে অর্থ দিয়ে তথায় হজব্রত সম্পাদনের জন্যে পাঠান। তিনি মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে সেই টাকার হিসাব দেয়ার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়

এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৯৯২ হিজরিতে তিনি 'কোনো এক পাজি' লোকের হাতে নিহত হন।

পরবর্তী সদর ছিলেন সুলতান খাজাহ্। সুয়ুরগাল সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি তখন ভিন্নপথে মোড় নিলো। সম্রাট আকবর ইসলাম পরিত্যাগ করেছেন এবং মক্কা থেকে সদ্য আগত নতুন সদর খোদাভক্তদের দলভুক্ত হয়েছেন। শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ লোকদের ওপর সুকল্পিত উৎপীড়ন শুরু হয়েছে এবং মহামান্য সম্রাট ব্যক্তিগত-ভাবে সমস্ত দানের তদন্ত করেছেন (দ্রষ্টব্য : তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ১০৯, শেষ স্তবক)। তখন জমিগুলি দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাহার করা হলো এবং বদায়ুনির মতে, যিনি এক হাজর বিঘা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর ভূমিই সর্বপ্রথম বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো। আবদুল নবীর প্রবল বিরাগভাজন হয়ে বহু মুসলমান পরিবার নিঃস্ব কিংবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

৯৯৩ হিজরিতে শিরাযের ফতেহ্ আল্লাহ্ (দ্রষ্টব্য : তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ৩৮ , সদর নিযুক্ত হন। সুয়ুরগাল-এর কাজকর্ম এবং এতৎসংগে সদরের মর্যাদা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোঠায় পৌঁচেছিলো বলে সদর হলেও ফতেহ্ আল্লাহ্ খানকে দাক্ষিণাত্যের দিকে বিশেষ কাজের জন্যে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিলো।—বদায়ুনি, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

তাঁর শিরাযি ভৃত্য কামাল তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে কাজ করেছে এবং ভূমিহীন আয়মাদারদের প্রতি যত্ন নিয়েছে, নানাস্থানে যাদের সামান্য জমি ছিলো ; কেননা সদরের মর্যাদা এর 'কামাল'-এর (পূর্ণতার) নিকটবর্তী হয়েছিলো। মাত্র পাঁচ বিঘা ভূমি দান করার মতো ক্ষমতাও ফতেহ্ আল্লার ছিলো না ; প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন কল্পিত সদর, কেননা সমস্ত ভূমি আগেই

বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই বাজেয়াপ্ত জমি বন্য জীবজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হয়েছিলো এবং এরূপে আয়মাদার কিংবা কৃষক কারুর অধিকারেই সেগুলি ছিলো না। যাহোক, এ সমস্ত উৎপীড়নের মধ্যেও সদরের বইপত্রে একটা রেকর্ড বেঁচেছিলো, যদিও, সেটা সদরের দপ্তরের মধ্যে কেবল তার নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

(তারিখ-ই ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ৩৬৮) ফতেহ্ আল্লাহ্ (সদর নিজে) মহামান্য সম্রাটের সম্মুখে এক হাজার টাকার একটি থলে রাখলেন, যে অর্থ তাঁর সংগ্রহকারী উৎপীড়নের সাহায্যে, অথবা আয়মাদার আর আসবে না কিংবা সে মৃত এই ছলনার আশ্রয়ে বসোয়ার পরগণার (যা ছিলো তার জায়গির) বিধবা ও ভাগ্যহত এতিমদের ওপর বলপ্রয়োগ করে আদায় করেছে; তিনি সেই থলে সম্রাটের সম্মুখে রেখে বললেন 'আমার সংগ্রহকারিগণ আয়মাদারদের নিকট থেকে কিফায়াত (অর্থাৎ, সংগ্রহকারিগণ মনে করেছে যে সুয়ুরগাল স্বত্বাধিকারীদের জীবনধারণের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণের চাইতে বেশী আছে) হিসেবে এই টাকা সংগ্রহ করেছে।' কিন্তু সম্রাট এই টাকা তাঁকে তাঁর নিজের জন্যে রেখে দিতে অনুমতি দিলেন।

পরবর্তী সদর, সদর জাহান খোদাভক্ত ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি সদর হিসেবে নিযুক্ত হলেও বদায়ুনি তাঁকে মুফ্তি-ই-মমলিক-ই-মাহ্রুশ, সাম্রাজ্যের মুফ্তি এ নামেই অভিহিত করতে থাকেন, যা তাঁর আগেকার খেতাব ছিলো। হয়তো সদরের পদের জন্যে পৃথক কর্মচারী রাখার আর প্রয়োজন ছিলো না। সদর জাহান সম্রাট জাহাংগীরের অধীনেও তাঁর চাকরি বজায় রেখেছিলেন।

সুয়ুরগাল ভূমির একটা বিরাট অংশ আবুল ফজল কৃত তৃতীয় গ্রন্থের ভৌগোলিক পীঠিকায় পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংগালী মুসলমানদের দৈহিক গঠন, মুখাবয়ব এবং বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ

বাংলার আদি মুসলমান বসতি স্থাপনকারীদের মুখের ও অন্যান্য অংশের বৈশিষ্ট্য যা-ই থাকুক না কেন, তাদের মুখাবয়ব ও এর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি এ দেশের জলবায়ু ও মাটির প্রভাবে সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাদের বংশধরদের চেহারা থেকে মুছে গেছে এবং লোপ পেয়েছে। কাজেই এ-দেশে তাদের বংশধরদের মধ্যে মোগল ও পাঠানদের দেহের উজ্জ্বল ও গোলাপী বর্ণ এবং আরব ও আজম-বাসীদের সাহস ও শৌর্যবীর্য আর দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন দেশের জলবায়ুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সে দেশের লোকদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং এতৎসংগে কষ্টকর জীবন ও দারিদ্র্যের চাপ সহ্য করে একটা জাতির পক্ষে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। একথা বলা হয়ে থাকে যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও ইংরেজগণ একই আর্য গোত্র থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে একথা অনুমান করা কি সম্ভব যে তারা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত? আকাশ এবং মাটির মধ্যেকার পার্থক্যের মতো তাদের পার্থক্যও বিস্তর। বৃত্তি এবং পেশা-ও মানুষের দৈহিক আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটায়। লক্ষ্য করুন একজন শিকারীর দেহের রং ও আকৃতি রোদ-বৃষ্টিতে

অনাবৃত থাকার ফলে কেমন পরিবর্তিত হয়ে যায়। সর্বোপরি, দারিদ্র্যের প্রভাব সব চাইতে বেশী অনিষ্টকর। এ ক'টি কারণ সত্বেও আরব ও আজমদের বংশধর বাংগালী মুসলমানদের দৈহিক গঠন ও আকৃতির সংগে এ দেশের হিন্দুদের দৈহিক গঠন ও আকৃতির একটা বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এ দুটি জাতিভুক্ত লোকদের মধ্যে যারা সম-মর্যাদাসম্পন্ন ছিলো এবং একই বৃত্তির অন্বেষণ করতো তাদের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করলেই এ পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

আসুন এখন আমরা ভাষার প্রমাণ সম্পর্কে বিচার করে দেখি। বাংলার মুসলমানদের কথ্য ভাষা ও এর শ্বাসাঘাত এবং তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের কথ্য ভাষা ও শ্বাসাঘাতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই মুসলমানদের কথিত বাংলা ভাষায় আরবী ও ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণ সুস্পষ্ট। বাংলার মুসলমানদের মূল যে বিদেশে, তাদের ভাষায় এই আরবী-ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণই তার পরিচায়ক; কেননা ধর্মের পরিবর্তনে ভাষার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুদের ধর্ম-পরিবর্তনই যদি এই মুসলমানদের উৎপত্তির কারণ হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই হিন্দুদের মতো একই ভাষায় কথা বলতো। অধিকন্তু, এই মুসলমানদের অভ্যাস ও রীতিনীতি তাদের হিন্দু দেশবাসীদের অভ্যাস ও রীতিনীতির চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এ সম্প্রদায় দুটির পুরুষ ও নারীগণ জীবনযাত্রা ও পেশায় যে রীতি অনুসরণ করে থাকে, তা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেই এ পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হবে। এ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে বাংলার জনসমষ্টির মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান শাখার অধিকাংশই আরবী, ইরানী, তুর্কী এবং আফগানী পূর্বপুরুষদের বংশধর।

সরকার মিঃ এইচ. এইচ. রিজলিকে বাংলার উপযাতি ও গোত্র-গুলির একটি নৃকুলতত্ত্বমূলক জরিপ প্রস্তুত করার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন ; সম্প্রতি তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যাতে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই জাতিগত জরিপের কাজটি আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়ের (বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি) সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে এর কিছু অংশ, যেখানে মুসলমানদের সম্পর্কে কথা আছে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

পরিতাপের বিষয় এই যে এই সরকারী ভদ্রলোকটি বাংলার বিভিন্ন গোত্রের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ নেয়ার সময় একটি মারাত্মক ও দুঃখজনক ভুল করেছেন, যদ্দারা মুসলমানদেরকে সংশয়িত আলোকে স্থাপন করা হয়েছে। ভুলটি হলো এই : তিনি হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে এর সংগঠনের ক্রম অনুসারে আলোচনা করেছেন, এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বিভিন্ন পেশানুযায়ী বিভক্ত প্রতিটি বর্ণের জন্যে পৃথক পৃথক দৈহিক পরিমাপের ফলাফল নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের প্রসংগে তিনি তাদের বিভিন্ন গোত্র ও পেশার কথা বিবেচনা না করে পাইকারিভাবে আলোচনা করেছেন, সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্যে সাধারণভাবে একটিমাত্র সিদ্ধান্তকেই কার্যে পরিণত করেছেন ; অথচ এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বহু গোত্র রয়েছে : যেমন—আরবী, ইরানী, তুর্কী, আফগানী ও অন্যান্য জাতির বংশধর ; হিন্দুস্তানের বিভিন্ন গোত্রের বংশধরেরাও আছে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো এবং এ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পেশাদার লোকও রয়েছে। সন্দেহ নেই যে পেশা মানুষের দৈহিক গঠনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ; কৃষিজীবী ও মাঠের শ্রমিকদের বেলায় একথা বেশী করে খাটে, যারা আবহাওয়ার

প্রভাবে বেশী পরিমাণে প্রভাবিত এবং বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাদের হার শতকরা ৬২-র চাইতেও বেশী। এমতাবস্থায় মিঃ রিজলি সমস্ত মুসলমানকে সামগ্রিকভাবে ধরে তাদের জন্যে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত খুঁজে পেয়েছেন দেখে এবং তারপর হিন্দু সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক গোত্র সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার সংগে মুসলমান সম্পর্কিত একটিমাত্র সিদ্ধান্তের তুলনা করে আমরা তাঁর নক্শাটির যাথার্থ সম্পর্কে সন্দেহ করছি। এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি নিশ্চয়ই অবিচার করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এদেশের মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে ধারণা করা একরূপ অসম্ভব; অন্যান্য গোত্রের সংগে মুসলমানদের সংমিশ্রণের ফলে এবং জলবায়ু, ভূমি, খাদ্য ও জীবন যাত্রার ধরনের জন্যে এবং তাদের পেশা ও রীতিনীতি বশতঃ তাদের দৈহিক গঠনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও তাদের দেহ ও মুখাবয়ব, অভ্যাস ও রীতিনীতি সম্পর্কে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই মুসলমানদের অধিকাংশই বিদেশী পূর্বপুরুষদের বংশোদ্ভূত। কোনো একটা পেশার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমানদের দৈহিক পরীক্ষার গড়পড়তা ফলের সংগে যদি ঐ একই পেশাধারী আরেকটি গোত্রের সমান সংখ্যক লোকের দৈহিক পরীক্ষার গড়পড়তা ফলের তুলনা করা যায় তাহলেই তা থেকে যথার্থ সিদ্ধান্ত পওয়া সম্ভব। কিংবা যদি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকটি যথাযথ-ভাবে শ্রেণী অনুসারে বিভক্ত করা যায় এবং তারপর এক সম্প্রদায়ের কোনো এক শ্রেণীর লোকদের তুলনা করা যায়, তাহলে সম্পূর্ণরূপে সঠিক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

রিজলি সাহেবের নৃতাত্ত্বিক জরিপের ফলাফল, যা তিনি ইংল্যাণ্ডের Ethnological Society-তে পেশ করেছেন, ১৮৯০ সালের ১৫ই

সেপ্টেম্বরের Oudh Akhbar-এ এভাবে সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে—

> মানুষের দৈহিক পরিমাপ ও নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা বাংলাদেশে দুটি স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করে; এগুলির একটির নাম আর্য ও অপরটি আদিম অধিবাসী। ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও শিখেরা প্রথমোক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা সাধারণতঃ দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ ও সুন্দর নাসিকার অধিকারী এবং তাদের সাধারণ চেহারা ইউরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চাইতে উৎকৃষ্টতর। শেষোক্ত জাতির নমুনা হলো কোল। তারা খর্বাকৃতিবিশিষ্ট, মলিন গাত্রবর্ণ ও থাঁদা নাকের অধিকারী এবং চেহারায় আফ্রিকার নিগ্রোদের কাছাকাছি। প্রসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক-দের সকলেই নাসা-সম্বন্ধীয় নির্দেশকের বিচারকে খুব মূল্যবান গোত্র বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করেন এবং ভারতবর্ষে যে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে তাতেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। বাংলার জাতি ও গোত্রগুলি এলোমেলো ও মিশ্রিত। নাকের বর্ধিত চেপ্টা ভাবের সমানুপাতে একটি জাতির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। একটি লোকের জন্ম যত নিম্নতর বংশে হবে তার নাক ততই চেপ্টা হবে, আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে যেমনটি দেখা যায়; তার জন্ম যত উচ্চতর বংশে হবে, ততই সে চেহারার দিক দিয়ে ইউরোপবাসীদের অনুরূপ হবে।

ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও শিখেরা যে আর্য জাতির প্রতীক, মিঃ রিজলির এ বিবরণ আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে শিখেরা কোনো নির্দিষ্ট জাতি নয়, কিংবা শিখ শব্দটির

দ্বারা যে সমস্ত লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যে নৃকুলতত্ত্বমূলক সাদৃশ্যের কথা কোনো মতেই প্রকাশ করে না। আর্য বংশেরই হোক কিংবা অনার্য বংশেরই হোক, যে ব্যক্তি বাবা নানকের প্রচারিত মতবাদকে গ্রহণ করেছে তাকেই শিখ বলা হয়। শব্দটি একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম, কোনো একটি নির্দিষ্ট গোত্র বা শাখা গোত্রের নাম নয়। 'শিখ' একটি পাঞ্জাবী শব্দ, যার অর্থ 'শিষ্য'। এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক তাঁর শিষ্যদেরকে এ নামেই সম্ভাষণ করতেন। এই শিষ্যগণ তাদের বংশধরদের দ্বারা 'গুরুকে শেখ' অর্থাৎ 'ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার শিষ্য' বলে অভিহিত হতো। যে কোনো লোক, তা সে উচ্চ বংশেরই হোক কিংবা নীচ বংশেরই হোক, প্রাথমিক আচারাদি নিষ্পন্ন করেই একজন শিখ-এ পরিণত হতে পারে; এই প্রাথমিক আচারকে তারা 'পহেল' বলে থাকে। তাদের এই ধর্মাচার পদ্ধতি নিম্নরূপ: জলে বাতাসা ভেংগে শরবত প্রস্তুত করা হয়; এই শরবতের মধ্যে গুরু কিংবা পুরোহিত তাঁর ডান পায়ের আংগুল চোবান; তারপর তিনি তাতে একটি নাংগা তলোয়ারের অগ্রভাগ রাখেন। অতঃপর তিনি নিজে সেই শরবতের কিয়দংশ পান করেন এবং বাকী অংশ নব-দীক্ষিত শিষ্যকে পান করতে দেন ও শরবতের কিছু অংশ তার মুখের ওপর ছিটিয়ে দেন। একই সময়ে তিনি তাঁদের দশম গুরু গোবিন্দ সিং কর্তৃক নির্ধারিত অনুশাসন সম্পর্কে তাকে উপদেশ দেন এবং ঐ সমস্ত অনুশাসন ঠিকভাবে পালনের দায়িত্বভার তার ওপর ন্যস্ত করেন। গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিং পর্যন্ত শিখ ধর্মমতের দশজন গুরু ছিলেন। এই গুরুদের সকলেই ছিলেন খত্রি সম্প্রদায়ভুক্ত।

প্রদেশগুলির বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে 'মখযান-ই-পাঞ্জাব' নামক ইতিহাস গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে—

> একথা জানা যায় যে শিখেরা পাঞ্জাবের উত্তর ও পূর্বাংশে প্রাধান্য লাভ করেছে। শিখদের এই অধিকতর প্রতিপত্তির প্রধান কারণ হলো এদেশ বহুদিন যাবৎ শিখদের শাসনাধীনে ছিলো এবং এসময়ে তারা যে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলো তাই অধিকাংশ হিন্দুকে শিখ ধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ করেছিলো ; এমন কি মেথর ও ঝাড়ুদারগণও 'পহেল' (শিখধর্মে দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান) গ্রহণ করতো এবং 'ধরংঘরেতি শিখ' বলে অভিহিত হতো। এ ধর্মবিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে প্রতিটি বর্ণের হিন্দুই ছিলো। কিন্তু যে ধরনের লোকই হোক না কেন 'পহেল' ধর্মানুষ্ঠান পালন করার পর তার পূর্ব জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং একজন শিখরূপেই সে পরিচিত হতো।

একইরূপে রাজপুত উপজাতির মধ্যেও মুসলমান এবং হিন্দু উভয় জাতির লোকই রয়েছে। এই উপজাতির যারা তাদের পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অনুগত রয়েছে এবং যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে কিংবা যারা মুসলমানদের বংশধর, তারা সকলেই রাজপুত। পাঞ্জাব প্রদেশে অসংখ্য মুসলমান রাজপুতও আছে।

বস্তুতঃ রিজলি সাহেব মুসলমানদের ওপর খুব বড় রকমের অবিচার করেছেন। 'The Tribes and Castes of Bengal' নামে অভিহিত তাঁর গ্রন্থটিতে এদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতির নাকের গড় উচ্চতা ও বিস্তারের নিম্নলিখিত

পীঠিকা রয়েছে—

বাংলার উপজাতিগুলির নাম		নাকের গড় উচ্চতা	নাকের গড় বিস্তার
ব্রাহ্মণ	...	৪৯·৭	৩৫
মুসলমান	...	৪৯·৪	৩৮·৩
কায়স্থ	...	৫০·২	৩৫·৩
বাগ্‌দী	...	৪৬·৭	৩৭·৬
বাউরী	...	৪৬·৬	৩৬·৭
চণ্ডাল	...	৯৬·২	৩৬·৭
গোয়ালা	...	৪৯	৩৬·৪
কৈবর্ত্ত	...	৪৮	৩৬·৬
মালী	...	৪৩·৯	৪১·৫
মাল বেহারী	...	৪৪·১	৪১
মুচি	...	৪৯·১	৪১
পোদ	...	৪৯·১	৩৬·৮
রাজবংশী	...	৪৮·৯	৩৭·৫
সদ্‌গোপ	...	৪৫·৬	৩৭·৭

এই পীঠিকা অনুসারে ব্রাহ্মণদের নাকের গড় উচ্চতা ৪৯·৭ এবং গড় বিস্তার ৩৫, কিংবা উচ্চতা বিস্তারের ১৪·৭ অধিক; এবং মুসলমানদের নাকের গড় উচ্চতা দেয়া হয়েছে ৪৯·৪ এবং বিস্তার ৩৮·৩; এস্থলে উচ্চতা বিস্তারকে ১১·১-এ ছাড়িয়ে গেছে। হিন্দুদের বেলায় বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে ধরে এবং মুসলমানদের বেলায় কোনো রকম শ্রেণী বিভাগ না করে সকল মুসলমানকে একটি জাতি ধরে এদের নাকের উচ্চতা স্থির করার ফলেই এ জাতি দুটির নাকের উচ্চতার আধিক্যের মধ্যে এ পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

আমরা যদি পূর্ব পৃষ্ঠার পীঠিকায় উল্লিখিত ১১টি হিন্দু বর্ণের ১১ জন লোকের নাকের উচ্চতা ও বিস্তারের গড় করি: যেমন—(১) ব্রাহ্মণ, (২) কায়স্থ, (৩) বাগ্দী, (৪) বাউরী, (৫) চণ্ডাল, (৬) গোয়ালা, (৭) কৈবর্ত্ত, (৮) মালী, (৯) মুচি, (১০) পোদ, (১১) রাজবংশী, (১২) সদ্গোপ এবং এ গ্রন্থে প্রদত্ত সংখ্যা অনুযায়ী একইরূপে ১২ জন বিভিন্ন মুসলমানের নাকের উচ্চতা ও বিস্তারের গড় করি, তাহলে হিন্দুদের নাকের গড় উচ্চতা হবে ৪৭'৮ ও বিস্তার হবে ৩৬'৫; অর্থাৎ উচ্চতা বিস্তারকে ১১'১-এ ছাড়িয়ে যাবে এবং মুসলমানদের নাকের গড় উচ্চতা ও বিস্তার হবে যথাক্রমে ৫০'২ ও ৩৮'৮; এ ক্ষেত্রে নাকের উচ্চতা বিস্তারকে ১১'৪-এ ছাড়িয়ে যাবে। ইহা লক্ষণীয় যে প্রদত্ত সংখ্যার গড় নির্ণয়ে সামান্য পরিবর্তন সম্পূর্ণ নতুন ফলের দিকে মোড় নেবে।

আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে গ্রন্থটিতে প্রশ্নচ্ছলে কেবল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মাপ-জোখের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের আধিক্য আরো বেশী করে প্রতীয়মান হয় যখন দেখি যে সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র ১৮৫ জন মুসলমান প্রজাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ সংখ্যার মধ্যে ২৭ জন চট্টগ্রামে, ৫৭ জন ময়মনসিংহে, ১৩ জন ত্রিপুরায়, ৩৮ জন ঢাকায়, ৩৩ জন ফরিদপুরে এবং অবশিষ্ট ১৭ জন বরিশাল নোয়াখালি ও পাবনা জেলায় পরীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু প্রজাদের ব্যাপারে বলতে গেলে তাদেরকে বাংলার পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সমস্ত জেলাতে সমান সংখ্যায় পরীক্ষা করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে উল্লেখিত প্রজাদের নামগুলি এ সন্দেহের উদ্রেক করে যে কেবলমাত্র নিম্নতম সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে; এবং এ ব্যাপারে আমি আমার নিজেকে সংশয়মুক্ত

করার জন্যে উক্ত বিষয় সম্পর্কে হাসপাতালের সহকারী বাবু কুমুদ বিহারী সামন্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করেছিলাম। এই ভদ্রলোক রিজলি সাহেবের কাজের সময় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর ওপর বাংলাদেশস্থ প্রজাদের নৃতাত্ত্বিক মাপজোখের কাজের দায়িত্বভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়েছিলো। আমি তাঁর নিকট জানতে পারি যে তিনি ইচ্ছা করেই উচ্চবংশজাত, সম্মানযোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানদের মাপজোখ গ্রহণ করেননি, কেবলমাত্র নিম্নতম শ্রেণীর মুসলমানদের মাপজোখই গ্রহণ করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে সামন্ত মহাশয় বলেন যে পূর্ব বংলার কেবলমাত্র নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের পরিমাপ নেয়ার জন্যে এবং তারা যে নিয়মিত মুখাবয়বের অধিকারী তার দৈহিক পরিমাপ পরীক্ষা না করার জন্যে কিংবা পরীক্ষা করলেও তিনি যাতে তা রেকর্ডভুক্ত না করেন তার জন্যে রিজলি সাহেব স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি পূর্ব বাংলার কয়েকটি কারাগার পরিদর্শন করেন এবং ঐ সমস্ত কারাগারের কয়েকজন কয়েদীর পরিমাপ নিয়ে সেগুলি রিজলি সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন, যিনি পরিশেষে সেগুলি তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন।

একচেটিয়াভাবে পূর্ব বাংলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা এবং এমন কি তাদের মধ্যে যারা সুষম মুখাবয়বের অধিকারী ছিলো তাদের পরিমাপ রেকর্ডভুক্ত না করার জন্যে রিজলি সাহেব যে আদেশ দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও অদ্ভুত ব্যাপার। কুমুদ বাবু নিজেই বলেছেন যে রিজলি সাহেবের উক্ত আদেশের ধরন তাঁর নিকট দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত ছিলো। এমতবস্থায় মুসলমানদের সম্পর্কে রিজলি সাহেবের ধারণাকে কিভাবে ন্যায়সংগত এবং তাদের প্রতি অনুকূল বলা চলে? এবং তাঁর

গ্রন্থে লিপিবদ্ধ মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর নৃতাত্ত্বিক ও মানব-জাতি বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার ফলাফলকে কি ভাবে নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য বলা চলে?

যাহোক, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলি যে যাবতীয় টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক বিচার ছেড়ে দিলেও সামান্যতম বিচার-বিবেচনার অধিকারী যে কোনো লোক উপলব্ধি করতে পারেন যে, বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই দেশের অন্যান্য জাতির চাইতে দৈহিক গঠন, মুখাবয়ব ও গাত্রবর্ণের দিক দিয়ে উত্তম; অন্য কথায় রিজলি সাহেবের মতানুযায়ী 'দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, সুন্দর নাক ও মোটামুটি সুশ্রী মুখমণ্ডল' যদি একটি উৎকৃষ্টতর জাতির লক্ষণ হয়ে থাকে তাহলে একই শ্রেণীর হিন্দুদের চাইতে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেই সেগুলির সাক্ষাৎ অধিক পরিমাণে মিলবে। যে নাসিকা-পরিচিতিকে জাতি-বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মূল্যবান পরিচায়ক বলে বিবেচনা করা হয় সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা মনে করি যে এদেশের অনার্যদের নাক প্রশস্ত, ক্ষুদ্র ও মোটা; পরন্তু অধিকাংশ মুসলমানের নাক সরু, উন্নত ও খাড়া। মোট কথা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের নাক একই মর্যাদাসম্পন্ন হিন্দুদের নাকের চাইতে সাধারণতঃ বেশী সুন্দর; এবং একইরূপে মুসলমানদের নিম্নতর সম্প্রদায়ের নাক সমপর্যায়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের নাকের চাইতে উত্তম। এ দুটি জাতির কেবল নাকের পরীক্ষা থেকেই একথা প্রমাণিত হবে যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান বাংলার আদিম জাতি ও উপজাতির বংশধর নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলির বিবরণ

বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারদের ইতিহাস বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কারণ, অধিকাংশ পরিবারই এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে যে ঐ সমস্ত পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত তাদের নিজেদের কুল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত বিবরণের কথা খুব সামান্যই জানে। অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্য তাদেরকে এতো বেশী নিম্ন পর্যায়ে এনেছে যে তারা এখন জনসমুদ্রের সংগে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আবার, কোনো কোনো উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রধান ব্যক্তিরা প্রায়ই রাষ্ট্র-বিপ্লব বা সরকারের আমূল পরিবর্তনের সময় তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে দেশের দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে পলায়ন করেছিলেন; সেখানে তারা তাদের পরিচয় গোপন করে অন্ধকারের মধ্যে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। কেবল মোগল আধিপত্য বিস্তারের সময়েই নয়, প্রতিটি সরকারের পরিবর্তন উপলক্ষে, ঐ বিশিষ্ট সময়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়কালেই এ নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ঐ সমস্ত শরণার্থীর বংশধরগণ সাধারণতঃ দীর্ঘকাল যাবৎ এমন হীন অবস্থায় জীবনযাপন করেছে যে, এ পরিবর্তিত অবস্থাই অবশেষে তাঁদের পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারস্থ লোকদের ক্রমবর্ধমান অজ্ঞতার জন্যে অনেক পরিবারই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

যে সমস্ত পরিবার উপরোল্লিখিত কারণগুলির ধ্বংসাত্মক পরিণামের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, বাংলা দেশে তাদের সংখ্যা এখনো অনেক। আমরা তাদের সবগুলির নাম করতে অসমর্থ। তার কারণ এই যে (১) তাদের সবগুলি আমাদের নিকট পরিচিত নয়; (২) আর তাদের সংখ্যা এতো বেশী যে কেবল তাদেরকে নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করতেই একখানি গ্রন্থ পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে আমরা ব্যাখ্যার সাহায্যে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও সুপরিচিত পরিবারের বিস্তারিত বিবরণ দেবো।

সর্বপ্রথমেই একথা জানা প্রয়োজন যে চারটি প্রধান বংশ—যথা: (১) সৈয়দ, (২) শেখ, (৩) মোগল এবং (৪) পাঠান— এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে গঠন করেছে বলে বিবেচনা করা হয়।

(১) সৈয়দ বংশ—এ বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে অপর তিনটি বংশের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী। এ সম্ভ্রান্ত বংশ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—একটি হলো বনি ফাতেমীয় সৈয়দের শাখা এবং অপরটি হলো উলভি বনি ফাতেমীয় সৈয়দের শাখা। যাঁরা ইমাম হাসান অথবা হোসেনের (তাঁদের ওপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) বংশধর, অর্থাৎ যাঁরা হযরত আলী এবং তাঁর স্ত্রী পুণ্যাত্মা বিবি ফাতেমার (তাঁদের ওপর আল্লার রহমত বর্ষিত হোক) বংশধর, তাঁদেরকে বলা হয় ফাতেমীয় সৈয়দ। উলভি সৈয়দ তাঁদেরকেই বলা হয়, যাঁরা (হযরত) আলীর ঔরসে বিবি ফাতেমাকে ছাড়া তাঁর অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বংশধর। উলভি সৈয়দের তুলনায় ফাতেমীয় সৈয়দেরা মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর, কেননা তাঁরা বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বংশধর। আবার, সৈয়দদের ফাতেমীয় শাখার কয়েকটি প্রশাখা

রয়েছে, যেগুলির প্রত্যেকটি একজন একজন করে বারো জন ইমামের (তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) নামে অভিহিত, কিংবা আরো বেশী সঠিকভাবে বলতে গেলে একথা বলা চলে যে, এ সমস্ত ইমামের প্রত্যেকের বংশধরদের পরিবার তাঁর নিজের নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন—হোসেনি সৈয়দ, হাসানি সৈয়দ, মুসাবি সৈয়দ, রযভি সৈয়দ, কাযেমি সৈয়দ, তকভি সৈয়দ, নকভি সৈয়দ এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রশাখা আছে। একইরূপে কোনো কোনো সৈয়দ তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামানুসারে তাঁদের বংশের নামকরণ করেছেন ; যেমন—যায়েদি, ইসমাইলি, তবতবাই কাদরি ইত্যাদি। কোনো কোনো পরিবার যে স্থানে বাস করেন সে স্থানের নামেই তাঁদের নামকরণ হয়েছে ; যেমন—বোখারি, কিরমানি, তবরেকি, শবযাওয়ারি ইত্যাদি। যে সমস্ত সৈয়দ তাঁদের পিতা ও মাতার দিক দিয়ে (হযরত) হাসান ও হোসেনের বংশধর তাঁরা হাসানি-উল-হোসেনি হিসেবে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং সৈয়দ বংশের অবশিষ্ট সকল শাখা ও পরিবারের চাইতে মান ও মর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়।

(২) কোরাইশি শেখ—এ বংশ খুব বেশী সম্মানীয়, কেননা আল্লার রসুল (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা থেকে কোরেশি শেখদের উৎপত্তি হয়েছে। এ বংশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে ; প্রতিটি শাখা সাহাবির (অথবা রসুলের সংগী) নাম ধারণ করেছে, যে সাহাবির বংশ থেকে শাখাটি উদ্ভূত হয়েছে ; যেমন উদাহরণস্বরূপ সিদ্দিকি, ফারুকি, আসমানি, আব্বাসি, খালেদি এবং এ ধরনের আরো পদবীর উল্লেখ করা যেতে পারে। সৈয়দ এবং কোরায়শি শেখ এ উভয় বংশের উৎপত্তিই হলো আরব দেশে। ইরান, আফগানিস্তান ও খোরাসানের

মহান সিদ্ধপুরুষ, বিখ্যাত আলেম ব্যক্তি এবং যশস্বী ধর্ম-শাস্ত্রবিদগণও শেখ এই বিশেষ নামে অভিহিত।

(৩) **মোগল**—ইহা মংগোলিয়ান জাতি; চেংগিজ খান এ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। এ জাতির লোকেরা ছিলো মূলতঃ প্যাগান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু চেংগিজ খানের পৌত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর এ জাতির বহু লোক তাদের রাজার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে এ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। চাঘতাই বংশের সকল রাজাই ছিলেন মুসলমান। ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্য বিস্তারের জন্যেই এ জাতি ভারতীয় জনসমষ্টির মধ্যে অত্যধিক সংখ্যায় প্রবেশ করেছে। এই মোগলবংশীয় লোকদের মির্যা কিংবা বেগ পদবী আছে। এ জাতীয় বহু শাখা ও প্রশাখা রয়েছে।

(৪) **পাঠান**—ইহা আফগান বংশ এবং এর আদি বাসস্থান ছিলো আফগানিস্তান। পাঠানেরা দীর্ঘকালের জন্যে ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে এ বংশের লোকেরা অত্যধিক সংখ্যায় এ দেশের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তাঁরা 'খান' নামে অভিহিত। এ বংশেরও বহু শাখা এবং প্রশাখা রয়েছে।

এখানে আরো কিছু বলা প্রয়োজন যে, এদেশের আদিম জাতিভুক্ত যে সমস্ত লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তারা ভদ্রতার খাতিরে শেখ, খান কিংবা মালিক নাম গ্রহণ করেছে।

উপরোল্লিখিত চারটি মূল বংশের একটা মোটা অংশ বাংলার মুসলমান জনসংখ্যায় রয়েছে। বাংলার মুসলমান জনসংখ্যা সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান বংশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সমন্বয়ে গঠিত; অর্থাৎ আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে এদেশে সৈয়দদের মধ্যে রয়েছে হাসানি-উল-হোসেনি, হাসানি, হোসেনি, রযভি, মুসবি,

নকভি, তকভি, যায়েদি, ইসমাইলি, তবতবাই, উলভি, বোখারি, কিরমানি, শবযাওয়ারি ইত্যাদি; শেখদের মধ্যে রয়েছে সিদ্দিকি, ফারুকি, ওসমানি, আব্বাসি, খালেদি, হারেসি ইত্যাদি; আর রয়েছে মির্যা, বেগ ও খানেরা, অর্থাৎ মোগল এবং পাঠান বংশের লোক।

শ্রদ্ধাস্পদ ও সম্ভ্রান্ত সৈয়দ ও শেখগণ গৌড়ের রাজাদের আমলে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারে নিজেদেরকে নিযুক্ত রেখেছেন। তাঁরা গৌড়ের রাজদরবার কর্তৃক আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং শাহ্ ও খন্দকার উপাধি দ্বারা বিশেষভাবে অভিহিত হয়েছেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত তাঁদের বংশধরগণ এই ধর্মীয় উপাধিগুলি বহন করছেন। খন্দকার পদবীটির ব্যবহার কেবল এ দেশেই সীমাবদ্ধ। গৌড়ের শাসনামল থেকেই এখানে শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মীয় নেতা ও তাঁদের বংশধরদের পদবী দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিলো। মোগল ও পাঠানদের মধ্যে 'মালিক' নামে একটি শ্রেণী আছে; প্রধানতঃ ঘোরি ও খিলজি আমিরগণই (সর্দার ও অভিজাত ব্যক্তিগণ) এই বিশেষ উপাধিটির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই আমিরগণ কোনো কোনো সময় হিন্দু ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদেরকে তাঁদের নিজেদের পদবী দানে সম্মানিত করতেন এবং নিজেদের মতো তাঁদেরকেও 'মালিক' বলে অভিহিত করতেন। তখন থেকেই এই হিন্দু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ও তাদের বংশধরগণ ঐ পদবী বহন করে আসছে। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত অন্য বহুজাতি এবং তাদের বংশধরগণ একইরূপে শেখ এবং খান নামে পরিচিত। শেখ, খান এবং মালিক নামে অভিহিত শ্রেণীগুলির মধ্যে সদ্বংশজাত এবং নীচ-বংশজাত উভয়বিধ লোকই রয়েছে। কাযি ও চৌধুরি নামে অভিহিত শ্রেণীগুলি শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান এ চারটি বিদেশী বংশের যে কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের

এ গোত্র নাম ধারণ করার কারণ এই যে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কেউ হয়তো কোনো সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অনুরূপ পদবী লাভ করেছিলেন। এদেশে কিছু সংখ্যক মুসলমান আছেন, যাঁরা খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত হয়েও মর্যাদার খাতিরে 'ঠাকুর' নামে অভিহিত, যা হিন্দুদের নেতৃস্থানীয় লোকদের বিশিষ্ট উপাধি। অপর পক্ষে যে সমস্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষেরা ঠাকুর, বিশ্বাস এবং এ ধরনের পদবীর অধিকারী ছিলো, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও তারা তাদের পুরণো কুল-নাম পরিত্যাগ করেনি এবং তাঁদের বংশধরগণও অদ্যাবধি সে নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। এদেশের ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি পরিবার আছেন যাঁরা এমন কি আদম (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) পর্যন্ত তাঁদের বংশ-পীঠিকা অনুসরণ করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে এমন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকও রয়েছেন, যাঁরা পূর্বপুরুষদের এমন একটি পরিবার থেকে উদ্ভূত, যার পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পক্ষই সমানভাবে উচ্চ বংশোদ্ভূত এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডীর বাইরে কখনো যাঁদের অসবর্ণ বিয়ে হয় না, কিংবা যে কোনো অবস্থায় যাঁরা অসম সম্পর্ক স্থাপন করেন না।

বাংলার চারটি পুরনো বিভাগ, যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র, বগ্রি ও বংগ দেশের মধ্যে প্রথম ও শেষ বিভাগে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় অধিক পরিমাণে বাস করেন এবং অবশিষ্ট দুটি বিভাগে সাধারণ লোকেরা বাস করে থাকে। আবার, ঘোরি ও খিলজি রাজ-বংশের শাসনামলে মুসলমানদের বংশধরগণ রাঢ় ও বরেন্দ্র বিভাগে প্রাধান্য লাভ করেছিলো এবং মুসলমান আগন্তুকদের বংশধরগণ মোগলদের আমলে বংগদেশ ও বগ্রিতে প্রাধান্য লাভ করেছিলো। পূর্বোক্ত মুসলমানগণ প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে বসবাস

করে এবং শেষোক্ত মুসলমানগণ প্রধানতঃ নগর ও সহরগুলিতে এবং এগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। অধিক সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ-পরিবারগুলি গ্রামে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে থাকেন ; এর কারণস্বরূপ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আগেকার দিনে সরকারের পরিবর্তনজনিত বিপ্লবের ফলে নগর ও সহরগুলিতে নানাবিধ বিপদের আশঙ্কা বিরাজ করতো ; সেগুলি প্রায়ই দুঃখজনক ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে পরিণত হতো ; তাছাড়া তখন শাসক-গোষ্ঠী ভদ্র ও অভিজাত সম্প্রদায়কে যে সমস্ত 'আয়মা' ও 'মদদ-ই-ম'আশ' এবং তদ্রূপ অন্যান্য দান মঞ্জুর করতেন সেগুলি সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চল থেকেই ধার্য করা হতো ; সুতরাং দানগ্রহীতাকে সে সমস্ত অঞ্চলে তাঁদের সম্পত্তিতে বাস করার উদ্দেশ্যে যেতে হতো। এ ধরনের ব্যবস্থা কেবলমাত্র বাংলা দেশেই প্রচলিত ছিলো না, হিন্দুস্তানের সর্বত্রই সাধারণভাবে এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো। এ ব্যবস্থা বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারকে ভারতের সর্বত্র বসবাস করার সুযোগ দান করে।

আমরা এখন সংক্ষেপে বাংলা দেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবারের বিস্তারিত বিবরণ দেবো। সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্ত ও সর্বোত্তম পরিবার হলো মুর্শিদাবাদের নওয়াব নাযিম পরিবার, যা অতুলনীয় না হলেও সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোন পরিবারই একে অতিক্রম করতে পারেনি। এই মহান পরিবার হাশানি-উল-হোসেনি সৈয়দের তবতবাই শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ পরিবারের জ্ঞাতি শাখাগুলি যখন যেখানেই বাস করেছে, তখন সেখানেই তারা নিয়ত একইরূপে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এবং সর্বত্র সাধারণ সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ পরিবারের উন্নততর আভিজাত্যের মর্যাদা এর ততোধিক পরিমাণে বিশিষ্ট মূলের উচ্চ মর্যাদার সমতুল্য।

এ পরিবারের বর্ণনা 'তারিখ-ই মানসুরি' গ্রন্থের 'উনদাতুল তালেব কি আনসাবি আল-ই-আবি তালেব' এ বিস্তারিত ভাবে দেয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ নগরে ও এর আশেপাশে শেখ, মোগল ও পাঠান বংশের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার বসবাস করে থাকেন। মফস্বলের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফতেহ্ সিং, সুস্তি ও বেলঘাটিয়ার সৈয়দ, ফতেহ্ সিং-এর খন্দকার এবং কাযী ও চৌধুরিও তাঁদের সদ্বংশের জন্যে বিখ্যাত; তাঁদের পরিবার খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানীয়। এতদ-অঞ্চলের খন্দকারগণ ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকরের প্রাচীনতম ও সম্মানীয় পরিবারের বংশধর। তাঁদের পূর্বপুরুষ কাযী শেখ সেরাজুদ্দিন গৌড়ের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে আগমন করেন; পরে তিনি গৌড়ের রাজধানীতে কাযি-উল-কুয্যাত বা প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ পরিবার পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় পক্ষ থেকেই উন্নত বংশজাত বলে বিশেষভাবে খ্যাত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ৭৬৯ হিজরি থেকে ৭৭৫ হিজরি পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

বীরভূম জেলায় যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছে তা সৈয়দ, শেখ ও পাঠানদের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁদের মধ্যে খুশতিগিরি, দমদমা, নওয়াদাহ্, হযরতপুর, সুরগাঁও, মান্দগাঁও ইত্যাদি এলাকার সৈয়দ, শেখ ও চৌধুরি এবং নগর ও অন্যান্য অঞ্চলের পাঠানগণ খুবই প্রসিদ্ধ। খুশ্তিগিরি ও অন্যান্য অঞ্চলের সৈয়দগণ অত্যধিক সম্মানীয় বংশের লোক এবং তাঁদের পরিবারগুলি প্রাচীনকালের মহান সভ্যতার অধিকারী। তাঁদের সকলের সাধারণ পূর্বপুরুষ ৮৯৯ হিজরিতে গৌড়ের সুলতান ফিরোয শাহের রাজত্বকালে এদেশে আগমন করেন; তাঁদের পূর্বপুরুষগণ সর্বদাই সম্মান ও মর্যাদাজনক পদ অধিকার করেছিলেন।

বর্ধমান জেলার অসংখ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে জাফরাবাদ, রায়গাঁও, চংঘরিয়া, বাঘা ইত্যাদি অঞ্চলের সৈয়দগণ, সমশার, সায়ের, মুরগাঁও, কাসিয়ারাহ্‌ ইত্যাদি অঞ্চলের খন্দকারগণ এবং মংগলকোট, ঝিলু, আরল, কেওগাঁও ও অন্যান্য অঞ্চলের শেখগণ খুবই সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ।

মেদিনিপুরের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সৈয়দ এবং পাঠানগণ খুবই প্রসিদ্ধ।

২৪-পরগণা জেলার মধ্যে কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমান এখানে এসে জমায়েত হয় এবং রাজধানীর জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে; তাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত ও বিশিষ্ট পরিবারের মুসলমান রয়েছে। মফস্বলেও বহু সদ্বংশজাত এবং সম্মানীয় পরিবারের মুসলমান বাস করছেন।

নদিয়া জেলার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বামনপুকুরের খন্দকারগণ, যেতই, মেহেরপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের সৈয়দ ও খন্দকারগণ তাঁদের বিশিষ্ট বংশের জন্যে প্রসিদ্ধ।

রাজশাহী জেলার মধ্যে বগুড়ার ও নাটোরের খন্দকারগণ তাঁদের সম্ভ্রান্ত বংশের জন্যে খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁরা আব্বাসি শেখ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং খলিফা হারুন-অর-রশিদের বংশধর। এদেশে তাঁদের পরিবার খুবই প্রাচীন। এ পরিবার গৌড়ের সুলতানদের শাসনামলে এদেশে আগমন করেন এবং সর্বদাই উচ্চ শ্রদ্ধা ও যথেষ্ট সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ খন্দকার মঈনুল ইসলাম, খন্দকার বদরুল ইসলাম ও খন্দকার রফি-উল ইসলাম অপরের চাইতে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদার অধিকারী হন এবং তাঁদের সময়ে তাঁরা ছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। গৌড়ের

সুলতানদের সম্পর্কে বর্ণিত বাংলার বিভিন্ন ইতিহাসে তাঁদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। নাটোর ও অন্যান্য অঞ্চলের পাঠানগণও খুবই প্রসিদ্ধ।

মালদহ জেলায় সৈয়দ ও পাঠানগণ তাঁদের উত্তম পরিবার ও সম্মানীয় বংশের জন্যে খুবই প্রসিদ্ধ।

ঢাকা শহর এবং এর চারিপার্শ্বস্থ এলাকায় মুসলমানদের সৈয়দ, শেখ, কাযি এবং অন্যান্য বংশের ও শাখার বহু সম্মানীয় ও সম্ভ্রান্ত পরিবার বসবাস করেন।

ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও কুমিল্লা জেলায় সৈয়দ, শেখ, পাঠান ইত্যাদি বংশের বহু সম্ভ্রান্ত ও উত্তম পরিবার রয়েছে; সিলেট এবং এর সংলগ্ন জেলাগুলিতেও তদ্রূপ মুসলমান বসবাস করছেন। চট্টগ্রাম এবং এর সংলগ্ন জেলাগুলিতেও একইরূপে বহুসংখ্যক সম্মানীয় ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার রয়েছে। উপরোক্ত মুসলমান পরিবার ছাড়াও বাংলা দেশে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত, উচ্চ, সম্মানীয় ও প্রাচীন মুসলমান পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান, যা গণনার অতীত। কিন্তু এ বিষয়ের ওপর আমার সীমিত তথ্য এবং এ অধ্যায়ের অপরিসর পরিধি এখানে তাঁদের সম্পর্কে যে কোনো স্বতন্ত্র আলোচনার বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে, যে ত্রুটির জন্যে আমি পাঠকবর্গের ক্ষমা পাবো বলে আশা করি।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমানদের পেশা

সদ্বংশজাত মুসলমান, অর্থাৎ আরব, তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানে জাত সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠানদের মধ্যে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী জীবিকার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সম্মানজনক উৎস ছিলো, তাদের মতে, তরবারি ও কলমের পেশা এবং ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় ও আদায়কৃত অর্থাদি। জীবিকা অর্জনের এ দুটি উৎস ব্যতীত অন্য সমস্ত পেশা এবং যাবতীয় হস্তশিল্প ও দোকানদারিকে তারা তাদের উচ্চপদ ও মর্যাদার পক্ষে অপমানজনক বলে বিবেচনা করতো। অধিকন্তু নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের যে ধারণা, তদনুসারে স্বহস্তে ভূমি চাষাবাদ করাও তাদের জন্যে অনুমোদনযোগ্য ছিলো না। তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া করা শ্রমিক দ্বারা তাদের ভূমি চাষাবাদ করাতো এবং এভাবেই ভূমির উৎপাদন থেকে লভ্যাংশ সংগ্রহ করতো। যে ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠিত প্রথার বাইরে চলে যেতো, সে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক হেয় প্রতিপন্ন হতো এবং তার সমস্তরের লোকদের ভালো ধারণা লাভে বঞ্চিত হতো।

এ রীতি কেবল উচ্চস্তরের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও এর পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। ইতিপূর্বে কোনো রাজপুতই তরবারির পেশা ব্যতীত

অন্য কোনো পেশার উমেদারি করতো না, কিংবা কোনো ব্রাহ্মণই ধর্মীয় পৌরোহিত্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায় অবলম্বন করতো না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই সংগে পুরনো ও অসুবিধাজনক রীতিও গেছে বদলে। রাজপুত জাতিও তাদের সম্প্রদায়ের বিধি নির্ধারিত ও অনুমোদিত জীবিকার্জনের উৎসের সীমিত পরিধির বাইরে চলে গেছে; তাদের পূর্ববিধি অনুযায়ী তারা কেবল একটিমাত্র পেশাতেই আবদ্ধ থাকতো। কিন্তু বর্তমানে তারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে, এমন কি তারা এখন স্বহস্তে ভূমির চাষও করে থাকে। ব্রাহ্মণদের বেলায়ও সে একই কথা, তারাও এখন বিভিন্ন চাকরিতে নিযুক্ত, বিভিন্ন পেশার অন্বেষণে রত এবং ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় থেকেও তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে; তাদের প্রথার একমাত্র নিষেধ নিজের হাতে লাংগল চালনা না করা। এই একটি মাত্র নিষেধ ছাড়া কৃষি সম্পর্কিত অন্য সমস্ত কার্যই তারা সম্পন্ন করতে পারে: কেননা সেই কাজ-গুলি কোদাল, বেলচা, কাস্তে কিংবা অন্যান্য যন্ত্র বা সরঞ্জাম দ্বারা সম্পন্ন করা যায়; এগুলি ছাড়াও তারা বীজবপন, চারাগাছ রোপণ, আগাছা নিড়ানো, জমিতে জল-সেচন, শস্য কাটা, শস্য সংগ্রহ করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগেকার দিনে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবিকার্জনের উপযুক্ত ও ভদ্রোচিত উপায় ছিলো অসামরিক ও সামরিক বৃত্তি এবং ভূসম্পত্তির আয়। কিন্তু যখন তারা এ সমস্ত উৎস থেকে জীবিকানির্বাহে ব্যর্থ হলো, তখনই তারা বিভিন্ন রকমের কারুশিল্প ও পেশা গ্রহণ করতে, বিভিন্ন চাকরি জীবনে প্রবেশ করতে এবং কৃষিসম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। সৈনিক শ্রেণীর মুসলমানগণ সামরিক

চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে অন্যান্য পেশা গ্রহণ না করে একমাত্র কৃষিকার্যকেই তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো। কেননা অন্য সমস্ত পেশাকে তারা তাদের মানসিক প্রকৃতির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করতো। কিন্তু উর্ধ্বতন মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি চাকরি এবং অধিকাংশ হস্তশিল্প খুবই অবমাননাকর পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে; তাদের মধ্যে কেউ যদি এ সমস্ত নীচ পেশায় নিযুক্ত হয় তাহলে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে এবং তাকে সামাজিক মর্যাদা হারাতে হয়। আগের দিনে বাণিজ্যকে সম্মানীয় পেশা হিসেবে বিবেচনা না করার ফলে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় বা ধনী বণিক নেই বললেই চলে; আর থাকলেও তা কেবল এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যেই আছে। হিন্দুস্তানের যে কোন অংশে যে সমস্ত বণিক ও দোকানদার দৃষ্ট হয় তাদের অধিকাংশই বণিক শ্রেণীভুক্ত হিন্দু পূর্বপুরুষদের বংশধর, যারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেও পূর্বপুরুষদের পেশাতেই নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরকেও একই পেশায় শিক্ষিত করে তুলেছে।

তথাপি খাঁটি সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে যদি বাণিজ্যরত দেখা যায়, যা খুবই দুর্লভ এবং তার অবস্থা যদি ঠিকভাবে তদন্ত করা হয় তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে, সে খুব সম্ভবতঃ এদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিংবা তা হলেও তখন বুঝতে হবে যে তার পূর্ব-পুরুষদের কেউ হয়তো কোন বড় রকমের সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়ে ও জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে এ পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, পূর্বে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রথা প্রাচীন বলে সম্মানিত হতো

এবং যা ছিলো প্রকৃতপক্ষে অধিক পরিমাণে কঠোর ও বাধ্যতামূলক তাই তাদের ওপর অবিসংবাদিত প্রভাব বিস্তার করতো। এভাবে পুরনো প্রথার বলে তাদের পুঁজিবৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস অর্থাৎ বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারেনি এবং তারা এখন দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থার শেষ স্তরে পৌঁছেছে।

বাণিজ্যের বিস্তৃত পরিধির তুলনায় সরকারী চাকরির পরিধি ছিলো খুবই সীমাবদ্ধ এবং শেষোক্ত পেশার লাভের পরিমাণ ছিলো ব্যবসা বাণিজ্যের লাভের অনুপাতে বহুলাংশে কম। জমির পরিমাণও ছিলো সীমাবদ্ধ এবং কৃষিকার্যের মুনাফা ব্যবসা-বাণিজ্যের মুনাফার মতো এতো অধিক সমৃদ্ধি দিতে পারে না। সমস্ত পেশার মধ্যে কেবল বাণিজ্যেরই রয়েছে প্রশস্ততম পরিধি ; এর মুনাফার সীমা নেই এবং এর সুবিধাও অপরিমিত। বাণিজ্য ছাড়া কোন জাতিই সম্পদের অধিকারী হতে এবং উন্নতি লাভ করতে পারে না। পৃথিবীতে বাণিজ্যরত জাতিগুলিই সকলের চাইতে অধিক ধনী এবং উন্নতিশীল। যারা বাণিজ্যকে পরিহার করেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সম্পদাহরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে।

একই কারণে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ মুসলমানদের মতোই দরিদ্র এবং নিঃস্ব ; অপরপক্ষে পৃথিবীর কোথাও কোন রাজ্যের অধিকারী না হয়েও ইহুদী জাতি তাদের বাণিজ্যিক প্রবণতা ও বাণিজ্যের আশীর্বাদে সর্বত্রই সমৃদ্ধ ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন।

আমাদের সমধর্মাবলম্বিগণ যদিও ব্যাপক ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অননুমোদনযোগ্য বলে মনে করেনি, তথাপি তারা দোকানদারি ও খুচরা-বিক্রয়কে নীচ এবং অসম্মানজনক ব্যবসায়

বলে বিবেচনা করতো। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, দোকানদার এবং খুচরা বিক্রেতা হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে হঠাৎ করে কারুর পক্ষে সফল বণিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কেবল মন্থর গতিতে ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হয়ে যে কোনো কারুশিল্পে কিংবা বাণিজ্যে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে এবং সে সমস্ত পেশা থেকে মুনাফা লাভের আশা করতে পারে। প্রথমতঃ আমাদের এমন কোনো বিরাট পুঁজি নেই যে, যদ্দারা আমরা হঠাৎ খুব বড় বণিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং দ্বিতীয়তঃ যে পর্যন্ত না আমরা বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার মতো পদ্ধতি ও ধারা আয়ত্ত করতে পারি সে পর্যন্ত আমরা এর থেকে মুনাফা অর্জন করার এবং লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারি না। কোনো লোক যেমন আগে স্কুলের ছাত্র না হলে পরে কিছুতেই একজন পণ্ডিত অধ্যাপক হতে পারেন না, এই বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারটিও তদ্রূপ। বর্তমান কালের চাইতে অতীত কালের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। অতীতকালে মানুষের পদ ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও যোগ্যতার ওপর, যার পক্ষে ধন-সম্পদের ভূমিকা ছিলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এখন ব্যাপার হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যাবতীয় প্রতিভা ও গুণাবলীর চাইতে অর্থই অধিকতর গুরুত্বশালী হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু, অর্থ সাহায্য ব্যতীত যে কোনো সুকুমার চারু-শিল্প ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। বর্তমানকালে ধন-সম্পত্তির অধিকার থেকেই স্বাভাবিকভাবে সমস্ত খ্যাতি ও প্রাধান্য আসে এবং প্রতিটি বিষয় বা বস্তুই ধন-সম্পত্তির অধীন। এমন কি ধন-সম্পদ না থাকলে কোনো লোকের

পক্ষে সম্ভ্রান্ত বংশগত মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে না, কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং গুণাবলীও খুব বড় একটা কাজে লাগে না। অতএব, বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত পুরনো ধারণানুসারে জীবনধারা পরিচালনাতেই দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা নিঃসন্দেহে বড় রকমের বোকামি। মানুষকে তার যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং সৎ ও বৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদের দ্বারা তার সামাজিক পদ-মর্যাদা বজায় রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে; আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতি বিধান এবং অধিকতর সচ্ছল করা অবশ্য কর্তব্য। যখন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ভালো বিচারবুদ্ধি ও বিজ্ঞতার কথা বিচার করি তখন আমরা আশা করতে পারি যে যদি তাঁরা বর্তমান যুগের মতো যুগে বাস করতেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের জীবনযাত্রা নির্বাহের রীতি নির্দিষ্ট করে যেতেন এবং তাঁদের সাধ্যানুসারে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে তাঁদের অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেননা, যে অবস্থাতেই পতিত হোন না কেন, নিজেদেরকে সেই অবস্থার উপযোগী করে চলাই হলো বিজ্ঞ লোকের পক্ষে সাধারণ কথা। পৃথিবীর অবস্থা সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে; পৃথিবীর এই পরিবর্তন হচ্ছে বলেই তদনুযায়ী আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ধরনেরও পরিবর্তন করতে হবে। বিজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা ইহাই নির্দেশ দেয় যে, মানুষকে তাদের যুগের উপযোগী শ্রেষ্ঠতম উপায়ে তাদের জীবিকার্জন করা ও তাদের অবস্থার উন্নতি করা উচিত।

যাবতীয় পেশা সম্পর্কে উচ্চ ও সদ্বংশজাত মুসলমান অর্থাৎ সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রথার কথা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি; সে বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট

হয়েছে যে কলম ও তরবারির পেশা এবং ভদ্র কৃষকের কাজ ছাড়া বাদবাকি সব পেশাই তাদের নিকট নীচ ও অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হতো ; হিন্দুদের সর্বোচ্চ সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের মধ্যেও একই প্রথার প্রচলন ছিলো বিধায় একথা অনুমিত হতে পারে যে, মুসলমানেরা সম্ভবতঃ এ প্রথার ব্যাপারে হিন্দুদের অনুকরণ করেছে, কিংবা তারা ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পূর্ব-পুরুষদের বংশধর এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়ার পরেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রথা তাদের উত্তর-পুরুষদের জন্যে রেখে গেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই একই প্রথা আরব, ইরান, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তানের উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো এবং কেবল তরবারি ও কলমের পেশাই এ জাতির নিকট সম্মানজনক পেশা বলে বিবেচিত হতো, অধিকন্তু, যেহেতু আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে কোনো হিন্দুই, তা সে যে কোনো শ্রেণীর বা যে কোনো সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, ধর্মে দীক্ষা নেয়ার পর চারটি প্রধান মুসলমান বংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেননা প্রকৃত সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান তারাই—যাঁদের পূর্বপুরুষগণ আরব, ইরান, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ঐ সমস্ত বিদেশী পিতৃপুরুষই এ প্রথা এদেশে এনেছিলেন এবং তাঁরাই তাঁদের পরবর্তী বংশধরদের নিকট ইহা চালান করে গেছেন। হিন্দু বা মুসলমানদের কেউ পরস্পরের কাছ থেকে এ প্রথা গ্রহণ করেনি। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের সমস্ত জাতির রীতিনীতি ও প্রথার মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে বলে কোনো এক জাতির কিছু রীতিনীতির সংগে অপর জাতিরও সেই রীতি-নীতির যথার্থ সামঞ্জস্য দেখা যায়।

অবশিষ্ট মুসলমানদের অর্থাৎ নিম্নতর সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন পেশা ও বাণিজ্যে নিযুক্ত বহু লোক রয়েছে। তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রতিটি শ্রেণী যে পেশা বা বাণিজ্যে নিযুক্ত, সেই পেশা বা বাণিজ্যের নামানুসারেই উক্ত শ্রেণীর পৃথক-ভাবে নামকরণ হয়েছে। যেমন—জোলা, ধুনিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই শ্রেণীগুলিতে দুই বংশের লোক রয়েছে: যারা বিদেশী পূর্বপুরুষদের বংশধর এবং যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এদেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপজাতীয় লোকদের বংশধর। প্রতিটি শ্রেণীর লোক বংশানুক্রমে তাদের পূর্বপুরুষদের পেশাকেই অনুসরণ করে আসছে এবং তাদের নিজ নিজ পেশা ও বাণিজ্যই নির্দেশ করে যে তারা কোন্ সম্প্রদায় ও উপজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্ত মুসলমানের পূর্বপুরুষদের জন্ম এদেশে এবং এদেশীয় অন্য সম্প্রদায় ও উপজাতির লোকদের মধ্যে যারা তাদের মতো একই বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে কিংবা একই পেশায় নিযুক্ত আছে, নৃকুলতত্ত্বের দিক থেকে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খুব হীন এবং নোংরা পেশায় নিযুক্ত কোনো লোক নেই, যেমন আছে হিন্দুদের মধ্যে। কারণ বাংলার কোথাও ঝাড়ুদার, ময়লানিষ্কাশনকারী, চৌকিদার কিংবা এ ধরনের পেশায় নিযুক্ত একজন মুসলমানও নেই। এ তথ্যটি লক্ষ্য করার মতো, কেননা ইহা প্রমাণ করে যে এমন কি নিম্নতম শ্রেণীর মুসলমানও নিম্নতম স্তরের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত নয়। আরব, ইরান প্রভৃতি দেশে এ ধরনের দাসোচিত পেশার যেরূপ অনুবৃত্তি হয় এদেশের মুসলমানদের দ্বারাও সেগুলির তদ্রূপ অনুবৃত্তিই

হয়ে থাকে। ঐ সমস্ত দেশে কোনো ঝাড়ুদার ও চৌকিদার নেই বলে এদেশের মুসলমানদের মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব নেই।

পূর্বে হস্তকৃত পেশাগুলি উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে সাধারণতঃ অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হলেও নির্দিষ্ট এমন কতক-গুলি কারু ও হস্তশিল্প ছিলো যেগুলিকে তারা সম্মানজনক পেশা হিসেবে গণ্য করতো এবং সে সমস্ত কারুশিল্পের নৈপুণ্যকে তারা বিশেষ গুণ বলে মনে করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেলাইয়ের কাজ, সুঁচিকর্ম ও সুতাকাটার কাজ অভিজাত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিলো। এ কারুশিল্পগুলি ছিলো দরিদ্র স্ত্রীলোকদের জীবিকার্জনের উৎস এবং অবসর সময়ে ধনীদের জন্যে এগুলি কাজ জোগাতো ও আলস্যের দুর্ভোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতো। কাজেই এ পেশাগুলি সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিলো এবং এগুলিতে পারদর্শিতা অর্জনকে স্ত্রীজাতির একটি মস্তবড় গুণ বলে বিবেচিত হতো। এ ধরনের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় বিক্রী করাটা তাদের পক্ষে কোনো প্রকারেই অসম্মান-জনক ছিলো না। ঐ ধরনের পেশাগুলি মহিলাদের মধ্যেই একচেটিয়া ভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো না, কিছুসংখ্যক ধার্মিক এবং খোদাভক্ত লোকও জীবিকানির্বাহের সব চাইতে খাঁটি ও সৎ উৎস মনে করে এসমস্ত পেশায় নিযুক্ত থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকজন বিখ্যাত রাজার জীবনী সম্পর্কে ইতিহাস উল্লিখিত আছে যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের রাজস্ব তাঁদের অধিকারে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা টুপি এবং এ ধরনের জিনিস তৈরী ও বিক্রী করার মতো হস্তকৃত শ্রমের দ্বারা তাঁদের নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংগালী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমানদের মূল কি তা আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি এবং এদেশে তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণ কি তা-ও আমরা দেখিয়েছি। এখন আমরা এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসেবে বাংগালী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়ার ইচ্ছা করছি।

এদেশের মুসলমানগণ তাদের জাতীয় সরকারের আমলে সমৃদ্ধ ও সুখী অবস্থায় কালাতিপাত করতো; কিন্তু মুসলমান শাসনের পতন ও বিপর্যয়ের ফলে তারা নিজেদেরকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করে, যাতে তারা তাদের আশ্রয়াধীনে নিজেদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ভোগ করতে পারে। কিছুকালের জন্যে তাদের আশা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিলো। যে পর্যন্ত তাদের আইন ও বিধিসমূহ বৃটিশ শাসনের মূলনীতি গঠনে সাহায্য করেছিলো, সে পর্যন্ত তারা বৃটিশ সরকার কর্তৃক এতো অধিক পরিমাণে-সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলো যে, ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সে চিন্তা তাদেরকে খুব কমই করতে হয়েছে। বৃটিশ শাসনাধীনে তারা জীবন ও সম্পত্তির যে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ভোগ করেছিলো তা তাদের প্রতি যথার্থই খুব বড় রকমের অনুগ্রহ

স্বরূপ ছিলো। কিন্তু সরকারের মূলনীতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে লাগলো এবং পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে নতুন আদর্শের ওপর শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠিত হলো। কিন্তু মুসলমানগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিবর্তিত শাসনব্যবস্থার উপযোগী করে তাদের আচরণের ধারার ততটুকু পরিবর্তন করতে পারেনি এবং তারা তাদের আগেকার জীবনধারা ও পুরনো অভ্যাসের প্রতিই অনুগত রয়ে গেছে।

একদিকে মুসলমানগণ অংশতঃ অদূরদর্শিতা এবং অংশতঃ ধর্মীয় সংস্কারের জন্যে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলো ও তাদের জাতীয় সাহিত্য অথবা আরবী ও ফার্সী শিক্ষার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলো। তাদের এই পশ্চাৎপরতার ফল হলো এই যে, ইংরেজি শিক্ষা থেকে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হলো। ব্যাপার যদি ভিন্নরূপ হতো তাহলে কি দাঁড়াতো! তাহলে সেক্ষেত্রে বাংগালী মুসলমানগণ এ সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী তাদের দ্রুত উন্নতিশীল সমধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী থাকতো এবং এমন কি তারা রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদেরকে অতিক্রম করে যেতো। কারণ, এদেশের মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের আগেই বৃটিশ জাতির সংস্পর্শে এসেছিলো এবং সূচনাতেই ইংরেজ শাসনের সংগে হিন্দুদের চাইতে অধিক পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলো।

অপরদিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এদেশে নবাগত ছিলো বলে তারা মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের কথা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি; তাই তারা মুসলমানদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ করতো। ইংরেজ জাতির ধারণা ছিলো এই যে, তাদের হাতে মুসলমানগণ

শাসনক্ষমতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বভাবতঃই তারা শত্রুতা-মূলক মনোভাব পোষণ করবে এবং সুযোগ পেলেই তারা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ করবে। এই শাসকগোষ্ঠী আরো মনে করেছিলো যে, হিন্দুগণ এদেশের আদিম অধিবাসী বলে তাদেরকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সাহায্য দান করা কর্তব্য। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী পূর্বোক্ত জাতিকে নিষ্পিষ্ট করতে এবং শেষোক্ত জাতিকে অত্যধিক সমাদর করতে লাগলো। কিন্তু এক পক্ষের প্রতি তাদের এই পক্ষপাতমূলক প্রবণতা এবং তার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অপর পক্ষের প্রতি বিরূপ মনোভাব যুক্তির দিক থেকে ছিলো সম্পূর্ণ অসমর্থিত। কেননা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কালেও মুসলমানেরা যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ইংরেজদের স্বার্থের আনুকূল্য করেছে, তখন এ ধরনের শত্রুতা কার্যকরী করার মতো ক্ষমতা হারিয়েও তারা শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করবে, তাদের সম্পর্কে এ ধারণা কিভাবে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায়? কিংবা হিন্দুদেরকে এদেশের আদিম অধিবাসী হিসেবে মনে করার কথাটা কিভাবে যথার্থ হতে পারে, যেখানে কোল, ভীল, সাঁওতাল এবং এ ধরনের অনেক আদিমতম উপজাতি রয়েছে? এসমস্ত উপজাতিই ছিলো এদেশের আদি বাশিন্দা, হিন্দুরা নয়। হিন্দুরা যদি আর্য-গোত্রভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগে তাদের ও দেশীয় মুসলমানদের সম্পর্কের মধ্যে কেবলমাত্র এটুকু পার্থক্য বিদ্যমান যে, তারা মুসলমানদের আগমনের মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছে।

অবশেষে মুসলমানদের অপরিণামদর্শিতা এবং এতদসংগে কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষমূলক আচরণ এই ভয়ানক ফলোৎপাদন করেছে

যে মুসলমানগণ রাষ্ট্রের যাবতীয় বিভাগের চাকরি থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবারের মুসলমানদের ওপরই এ ক্ষতিকর অবস্থা সবচাইতে বেশী কার্যকরী হয়েছে। এ অবস্থার ফলে সমগ্র মুসলমান জাতির মধ্যে একই ভাগ্যের সম্মুখীন হওয়ার মতো আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ, যারা এদেশে সংখ্যার দিক থেকে ছিলো সবচাইতে বেশী ও কৃষিকর্ম ছিলো যাদের পেশা এবং রাষ্ট্রীয় চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে যারা কৃষি সম্পর্কিত পেশায় নিযুক্ত হয়েছে, তারাও দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে; তাদের এই উন্নতির কারণ হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধ অবস্থা ও সেই সূত্রে কৃষি উৎপাদনের জন্যে উন্মুক্ত রপ্তানীর পথ এবং তদুপরি আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান। শ্রমিক গোষ্ঠীও তাদের বেতনের বর্ধিত ও বর্ধিষ্ণু হারের জন্যে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় আছে। কাজেই আমাদের মতে এদেশের উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলি ছাড়া বাদবাকী সমস্ত অধিবাসীই বৃটিশ শাসনের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এই উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রায় সকলেই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে এবং তাদের অনেকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে।

এখন আমাদেরকে বিচার করে দেখতে হবে যে, এ দেশের মুসলমানগণ বৃটিশ শাসনকে মেনে নিয়েছিলো কিনা এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পর্কে কোনো রকমের ভাব-প্রবণতা হৃদয়ে পোষণ করতো কিনা। এ ব্যাপারে স্যার ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টার কিংবা কলোনেল নসাউ লীজ যা খুশি তা-ই বলুন, কিন্তু আমরা নিজেরা এদেশের মুসলমান অধিবাসীদের জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে তাদের ভাব-প্রবণতার অবস্থা সম্পর্কে যতদূর

অবগত আছি তাতে আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত একথা বলতে পারি যে, আমরা মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের কম হিতাকাঙ্ক্ষী নই এবং এক মুহূর্তের জন্যেও আমাদের মনে এ ইচ্ছা পোষণ করি না যে রুশ শক্তি কিংবা এমন কি কাবুলের আমিরের হাতেও এদেশের বৃটিশ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হোক এবং এ দু'টি শক্তির যে কোনো একটি তাদের স্থান অধিকার করুক; যদিও কাবুলের আমির একটি প্রতিবেশী মুসলমান রাষ্ট্রের শাসক। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা পাওয়ার জন্যে আকাঙ্ক্ষা করি তা হলো আমাদের নিজেদের উন্নতি ও নিরাপত্তা এবং আমাদের পক্ষে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই অন্যান্য ধর্মীয় কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে অন্যদের ক্ষতি না করে কিংবা তাদের প্রতি অন্যায় না করে আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও সুবিধা লাভের চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পবিত্র রসুল (তাঁর ওপর আল্লার শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কাবার সীমানায় শান্তি ও নিরাপত্তা না থাকে তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে এমনকি কাবা পরিত্যাগ করে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজার রাজ্যে চলে যেতে হবে, যদি সেখানে তা পাওয়া যায়।[১] আমরা আমাদের রসুলকেই

১ ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ইহা কেবলমাত্র মক্কার হাশেমি বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং সংশয়বাদী কোরাইশদের বিরুদ্ধে আশ্রয়লাভের জন্যে মুহম্মদ প্রধানতঃ তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁর নবুয়তের সেই পঞ্চম বছরে প্রথম হিজরা অর্থাৎ অত্যাচারের দেশ থেকে 'যেখানে কেউ অন্যায় আচরণের সম্মুখীন হয়নি সেই ন্যায়ের দেশে' পলায়নপর্ব সংঘটিত হয়। এ দেশটি ছিলো 'ন্যায়পরায়ন রাজা' নাজাসি কিংবা নিগাস কর্তৃক শাসিত খ্রিস্টান রাজ্য আবিসিনিয়া। এ ঘটনার সময় হযরতের সংগী ছিলেন তদীয় জামাতা ও আফফানের পুত্র হযরত ওসমান এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ

অনুসরণ করি, তাঁর নির্দেশ পালন করি এবং তাঁর নির্দেশিত পথেই আমরা আমাদের উন্নতি লাভের চেষ্টা করি। আমাদের প্রতি এবং আমাদের পতনশীল অবস্থার প্রতি সরকারের ঔদাস্য সম্পর্কেই আমাদের একমাত্র অভিযোগ। আমাদের এ অভিযোগ উত্থাপনের কারণ হলো সরকারের এ ধরনের ঔদাস্য এবং উপেক্ষার জন্যেই আমরা ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু এ অভিযোগকে যদি কেউ মুসলমানদের রাজদ্রোহের লক্ষণ বলে খামখেয়ালীভাবে ও অন্যায়রূপে ব্যাখ্যা করতে চায়, করুক। আমাদের ন্যায্য অংশ না পাওয়ার ব্যাপারে আমরা আমাদের শাসক গোষ্ঠীর ভুলের শিকার হয়েছি বলে সরকার তাঁর পিতৃসম তত্ত্বাবধানের দ্বারা আমাদের দাবির প্রতি কি সুবিচার করেন তা দেখার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করছি। যাহোক, আমরা বিশ্বাস করি যে, যখন আমাদের শাসকগণ আমাদের সহিত আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন তখন তাঁরা অবশ্যই আমাদের প্রতি অধিকতর সুবিচার প্রদর্শন করবেন।

হযরতের কন্যা। এখানে স্বদেশত্যাগী প্রবাসিগণ সদয় ব্যবহার লাভ করেছিলেন এবং তাঁদেরকে সে দেশ থেকে বিতাড়নের জন্যে কোরাইশদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো। পরের বছর অর্থাৎ হযরতের নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে মক্কার অত্যাচার তীব্রতর আকার ধারণ করলে তখন থেকে দ্বিতীয় পলায়ন পর্ব সংঘটিত হয়। এই দ্বিতীয়বার দেশত্যাগীদের সংখ্যা প্রথমবারের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো; আমাদের প্রাপ্ত খবর থেকে জানা যায় যে, এই খ্রিস্টান রাজ্যে বিশ্বাসীদের সংখ্যা তাঁদের শিশু সন্তানদের ছাড়াই ১০১ জনে পৌঁছেছিলো। এখানে তাঁরা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন; তাঁদের অনেকেই ইসলামের বিজয় অভিযানের বহুদিন পর পর্যন্তও সেখানেই ছিলেন এবং হিজরির সপ্তম সালে খায়বার অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা হযরত মুহম্মদের সংগে পুনর্মিলিত হননি।'—রওযাত-উস-সাফা।

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে টীকা

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমার থেকে জানা যায় যে, বাংলা দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ১৯৫৩৬২০ জন বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তাদের সংখ্যা ছিলো ২১৭০৪৭২৭ জন এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ছিলো ২৩৬৫৮৩৪৭ জন। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে ইসলামের ধর্মান্তরিত-করণ বৈশিষ্ট্যের ফলে কিছু লোক এধর্মে দীক্ষা নিয়েছে বটে, কিন্তু ১৮৮১—১৮৯১ দশকে অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা এই সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে খুব বেশী সাহায্য করতে পারেনি। এ ব্যাপারে আদমশুমারের রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট অফিসার যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ ও নির্ভুল। তিনি বলেছেন: 'একথা সত্য যে মূল বাংলায় মুসলমান ধর্মের বৃদ্ধি বিশ্বাস-সম্পর্কিত প্রভাবের চাইতে বরং দৈহিক প্রভাবের সংগেই অধিক পরিমাণে জড়িত।' একথা পরিসংখ্যানের সাহায্যে প্রমাণিত হয় না যে, বাংলার যে কোনো অঞ্চলে খুব বেশী সংখ্যক ধর্মান্তরিত ব্যক্তি আছে যারা ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে অমুসলমান ছিলো কিন্তু বিগত দশ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে; কিংবা সংখ্যার দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় না যে বাংলার কোনো একটি নির্দিষ্ট জেলায়

মাত্র কয়েকশত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির আংশিক কারণ ছিলো বিগত আদমশুমারে অবলম্বিত লোকগণনার উন্নততর ব্যবস্থাবলী। কিন্তু এই আংশিক কারণ ছাড়াও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি প্রধান কারণ ছিলো। আগে মুসলমানদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান ছিলো যে আদমশুমারের উদ্দেশ্য হলো মাথাপ্রতি নতুন কোনো কর ধার্য করা কিংবা তাদের মধ্য থেকে সেনাবাহিনীর জন্যে লোক সংগ্রহ করা; এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তাদের প্রকৃত সংখ্যা গোপন রাখতো; কিন্তু এখন তারা কালাতিক্রম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছে বলে এখনকার আদমশুমারে তারা তাদের ও তাদের পরিবারস্থ সমস্ত লোকের প্রকৃত সংখ্যা জানিয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি বেশী পরিমাণে নির্ভর করে বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহের ওপর, বা বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলির অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা অগ্রগামী। মুসলমানেরা বিভিন্ন প্রকারের পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করে থাকে বলে সবলতর দৈহিক গঠনের অধিকারী এবং ইহা তাদের দৈহিক পুষ্টি ও সন্তানোৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি করে। এরূপে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমার যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করে তা হলো মূল বাংলার মুসলমানেরা বিগত উনিশ বছরের মধ্যে কেবলমাত্র তাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভাইদের সংখ্যাসাম্যই অর্জন করেনি, উপরন্তু পনেরো লক্ষ সংখ্যায় তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে।